না আকাশ না পাতাল

সমরেশ মজুমদার

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৫ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীদেবদত্ত নন্দী
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬।

দেবুনাথ

অনুজেষু



এই লেখক, যে কিনা লেখকের ভূমিকায় অভিনয় করে এবং সেটা মন্দ করে নি বলেই অল্পবিস্তর পরিচিতি, কিছু স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে গেল আচমকাই যা শুধু এই পশ্চিমবাংলায় হয়ে থাকে, একবার বিদেশ ঘুরে আসার পর তাকেও টানতে লাগলো সিকিওরিটি কণ্ট্রোল, কাস্টমস চেকিং, তিরিশ হাজার ফুট উঁচুর আকাশ। পাহাড়ে একবার গেলে যেমন পাহাড় টানে তেমনি এও একরকমের টান। আর লেখকের ভূমিকায় ভালো অভিনয় করার প্রমাণ হিসেবে একটা নেমন্তন্ন এল সুদূর নরওয়ে থেকে। ওদেশের বার্গেন শহরের উৎসবে আমাকে যেতে হবে। টিকিট এল উঁচু ক্লাসের। যা ভাঙিয়ে আমি আরও কয়েকটা দেশে চক্কর মারতে পারি। বেশ মজাদার ব্যাপার।

লেখাটার নাম পাল্টে গেছে তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অনেকে। মনোজ আমাকে আমেরিকার আকাশ দেখিয়েছিল, পাতালও। সে আজ নেই। কেউ যদি না দেখায় দেখার চোখ তো আজও আমার ফুটল না। ভালবাসার মতো। কেউ যদি আমায় না ভালবাসে তো

বুঝতে পারি না ভালবাসা কাকে বলে। আর বুঝি যখন তখন যন্ত্রণাটা পাই। ভালবাসার অন্য নাম যে যন্ত্রণা তা আপ্রাণ বুঝেও মুক্তি চাই তা থেকে ভালবাসার মানুষের কাছে। তিনি চান যন্ত্রণাটা থাকুক, যদ্দিন থাকবে তদ্দিন তিনি সম্রাজ্ঞীর মতো বিচরণ করতে পারবেন। আকাশ পাতাল যদি ধন্দ, ভালবাসার এবং, না-ভালবাসার ক্ষেত্রেও তবে, এ লেখা যা লিখতে যাচ্ছি তাতে কোনো ধন্দ নেই। স্নেহের মতো। তাই দু দুটো 'না' বসল। না আকাশ না পাতাল।

বার্গেনে বঙ্গসন্তানের সহ্য শক্তি শেষ সীমায় পেঁছাবে ঠাণ্ডার কারণে। একটা ছোট্ট সমুদ্র আছে শহরের গা ঘেঁষে, চমৎকার মাছের বাজার আছে তার বন্দরে, মাছ ধরাই তো ওখানকার অন্যতম কারবার। কিন্তু সহ্যশক্তি যার ঘা খেয়ে খেয়ে প্রস্তরযুগে চলে গিয়েছে সে যখন উৎসবে যোগ দিয়ে জানতে পারল তাকে কবিতা পড়তে হবে কারণ সম্মেলনটা কবিদের তখনকার অবস্থা পাঠক কল্পনা করুন। যার কলমে কবিতা বের হয় নি কোনোদিন, ছন্দ দূরে থাক, কবিতার ভাষা যার কাছে সোফিয়া লোরেনের চেয়েও দূরবর্তিণী, মরে গেলেও এক কলম কবিতা লিখতে পারে নি বলে নিজস্ব নারীর মুখে সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতা শুনে ঈর্ষায় জ্বলতে হয় যাকে, তাকে কবিতা পড়তে হবে বাংলায় এবং ইংরেজিতে। সম্মেলনটা কবিদের। আমার নাম যাঁরা পাঠিয়েছিলেন তাঁরা এখবর জানতেন না।

কে যেন বলেছিল কবিতা আর গল্প কাছাকাছি চলে এসেছে! কবিরা কবিতায় যখন গল্প লেখেন তখন গল্পকারের হাততালি পান, কিন্তু গল্পকারের গল্পে কবিতা? সে যে সোনার পাথরবাটি।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মাঝরাত্রে অনেক চেষ্টা করলাম কবিতা লিখতে। সুনীল গাঙ্গুলীকে ঈর্ষা করা ছাড়া কোনো ফল লাভ হলো না। কলম হাতে নেওয়ার পর থেকে তো কবিতা লিখিনি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। সেখানে ঠাণ্ডা প্রায় জিরো ডিগ্রি। আমি কাগজ

খুঁজছি আর ছিঁড়ছি। হায় ঈশ্বর একটা কবিতাও তো দিতে পারতেন আমার কলমে!

আমাকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেটি ওদের কাছে হোটেল নয়। যদিও ভারতবর্ষে ওটাকে থ্রি স্টার হোটেল বলে স্বীকার করা হয়। নরওয়ের মানুষ বলেন পেশন। ঝকঝকে ঘর, পুরু কার্পেট পাতা, বাথরুম মন হরণ করবে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বলতে সকাল ন'টা পর্যন্ত বুফে ব্রেক-ফাস্ট। অন্য সময় এক কাপ চা চাইলেও পাওয়া যাবে না। আমি নামতাম সাড়ে আটটা নাগাদ, যেহেতু কেউ মানা করার নেই তাই পেট পুরে খেয়ে নিতাম। পরদিন সকালে ওখানে বসে হ্যাম চিবোতে চিবোতে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত গল্পটির কথা মনে পড়ে গেল। একটি লোক একদিনের জন্যে এসেছিল বিদেশের শহরে যেখানকার জীবনযাত্রা এখনও মধ্যযুগে আটকে রয়েছে। ভাষার সমস্যা তো ছিলই, লোকটার পকেটে টাকাও ছিল না। তাই নিয়ে এক রূপক গল্প যা সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায় লিখতে চেয়েছিলাম। মনে হলো সেটিকেই পড়ে দিই।

পাঠক, সেই কবিতার আসর বসেছিল দুটি ক্ষেপে। দুবারই আমাকে গল্পটি ছোট্ট করে পড়তে হলো। মজার কথা হলো, শ্রোতাদের নব্বুই ভাগ ইংরেজিও বোঝেন না। ওঁরা হয়তো ভাবলেন আমি একটা লম্বা কবিতা পড়লাম। কেন যে এমন অনুষ্ঠানে এশিয়ার লেখক কবিকে নিয়ে যাওয়া হয় তা আমার বোধগম্য হয় না। দুটো অধিবেশনের মাঝখানে ঘণ্টা তিনেকের বিরতি। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলোমেলো কিছুটা হেঁটে আমাদের লালদিঘির মতো একটা জায়গা খুঁজে পেলাম। ফিনফিনে রোদ উঠেছে কিন্তু ঠাণ্ডা যেন রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। হঠাৎ জলের ধারে একটা ক্যারাভান চোখে পড়ল। ক্যারাভানের গায়ে লেখা রয়েছে 'ভারতীয় মহিলা জ্যোতিষী আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। আসুন, নিজের ভাগ্য জেনে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ

করুন।'

চমকিত হলাম। এ আবার কি কাণ্ড। কলকাতার কাগজে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আজকাল ছবি দিয়ে মহিলা জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন করা হয়। তাঁরা কেমন হাত পড়েন জানি না তবে কয়েকজন তো রীতিমত সুন্দরী। সেই ভারতীয় নারী এখানেও পেঁছে গিয়েছেন? ক্যারা-ভানটি বেশ আধুনিক স্টাইলের। জানলায় পর্দা, দরজাতেও কার্পেট। লক্ষ্য করলাম জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষ ঢুকছে আর মিনিট দশেক কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটু ফাঁকা হতে পা বাড়ালাম। দরজায় পা রেখে উঁকি মারতে দেখলাম দু'জন মহিলা আর একটি বাচ্চা ভেতরের টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করেছেন। ক্যারাভানের দেওয়ালে স্লিপিং বাঙ্ক ঝুলিয়ে রাখা আছে। আমাকে ইশারায় বসতে বলে এক ভদ্রমহিলা মাঝখানের পর্দা টেনে দিলেন। দুটো চেয়ারের উল্টো দিকে ফিক্সড্ টেবিল। টেবিলের ওপাশে আর একটা চেয়ার। পাশের দেওয়ালে নানারকম জ্যোতিষের চিহ্ন ছড়ানো। দুই ভদ্রমহিলাকে যেটুকু দেখেছি অনেকটা ইরানীদের মতো, ঘাগরা পরা।

মিনিট পাঁচেক বাদে একজন পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে আমার উল্টো-দিকের চেয়ারে বসলেন, 'ইয়েস?' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা আমাকে জরিপ করছেন বোঝা গেল।

'আপনি হাত দেখেন না কুষ্টি বিচার করেন?'

'হাত। কারণ এদেশে কেউ কুষ্টি করায় না। আপনি কি হাত দেখাবেন?'

'আজ্ঞে না। ক্যারাভানের গায়ে আপনার বক্তব্য পড়ে আলাপ করতে এলাম।'

ভদ্রমহিলা একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর চুল কালো, চোখের মণিও গায়ের রঙ একটু ফ্যাকাশে। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এটাআমার ব্যবসার

সময় ।'

'জানি। দশ মিনিট করে আপনার ক্লায়েণ্টরা থাকেন এখানে। কত চার্জ নেন ?'

'হাত না দেখলে পয়সা নিই না আমি। আপনি কোন্ দেশের লোক ?'

'ভারতবর্ষ।

'জিজ্ঞাসা করুন কি জানতে চান ?'

'আপনি কি ভারতীয় ?'

মাথা দোলালেন মহিলা, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ প্রদেশের ?'

'শুনেছি সিন্ধু উপত্যকার কাছে থাকতেন আমার পূর্বপুরুষেরা।'

থাকতেন মানে ? আপনি ভারতবর্ষে যান নি কখনো।'

'না। তিন চারশ' বছর আগে ওঁরা চলে এসেছিলেন জার্মানিতে।'

'তাহলে আপনি ভারতীয় হচ্ছেন কি করে ?'

আমরা নিজেদের ভারতীয় বলেই মনে করি, ইনফ্যাক্ট ভারতীয় ভাবি বলেই জার্মানের সঙ্গে ইংরেজি শিখি।'

'ইংরেজি তো ভারতীয়দের ভাষা নয়।'

'কে বলেছে আপনাকে। আমরা যেসব ভারতীয়কে জানি তাঁরা ইংরেজিই বলেন।'

কিন্তু তিন চারশ' বছর জার্মানিতে থেকে আপনাদের তো জার্মান হবার কথা।'

'না। আমাদের যে গোষ্ঠী চলে এসেছিল এখন পর্যন্ত রক্তের সম্পর্ক তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। গোষ্ঠীর মধ্যেই ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়। তবে বেশিদিন এই রীতিটা চালু রাখা যাবে না। বুঝতেই পারছেন।'

'আপনি হাত দেখা শিখলেন কার কাছে ?'

'মায়ের কাছে। শীতকালে ব্যবসাটা বন্ধ থাকে। গরম কালে এই ক্যারাভান চালিয়ে প্রত্যেক বছর এক একটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশে

চলে আসি।'

'জার্মানি থেকে নরওয়ে তো অনেক দূর। এটা চালায় কে?'

'আমি আর আমার দিদি। হ্যাঁ, দূরত্বটা বেশ, কষ্টও হয়। তবে টাকাটা ভালো পাওয়া যায়।'

'কিরকম রোজগার আপনার?'

'ভালোই। আপনাকে হিসেব দিতে যাবো কেন?'

'বাচ্চাটি কে?'

'আমার?'

'আপনার স্বামী?'

'ও এখন জার্মানিতে। দুদিন অন্তর ফোনে কথা বলি। আমার ক্যারাভানে ফোন আছে। ছেড়ে থাকতে ছেলেদের অবশ্য কোনো অসুবিধে হয় না। মেয়েদের হয়।'

'এখানে কেউ আপনাকে বিরক্ত করে না?'

'করে। রাত্রে দরজায় টোকা মারে। পুলিশকে ফোনে ডাকি। ওরা চটপট চলে আসে। তবে এখানকার লম্পটরাও নিজেদের মন্দ ভাগ্য শুনলে আপসেট হয়ে পড়ে।'

'যেমন?'

'একদিন এক ভদ্রলোক এলেন সন্ধেবেলায়। হাফ ড্রাংক। জানতে চাইলেন ভবিষ্যৎ। হাতে যা ছিল বললাম। টাকা দিলেন। তিন ডবল। তারপর জানতে চাইলেন আমাকে পাওয়া যাবে কি না। আমি না বললেও কানেই তুলছেন না। এমন ভাব করছেন যে আমাকে পেয়ে গিয়েছেন। এরকম কেসে পুলিশকে ফোন করলে ওরা আসে না কারণ ভদ্রলোক আমাকে ব্যবসার সময়ে শারীরিক অসুবিধের মধ্যে ফেলেন নি। হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর ভবিষ্যৎ কি? মাথায় মতলব এল। বললাম, তিনি আজ রাত্রে খুব সুখী মহিলা হবেন। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'সেকি! ও কি করে সুখী

হবে ?' বললাম, 'হাত বলছে তিনি আজ রাত্রে আপনার সোহাগ পাবেন।' ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এবং তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। মনে হলো ওকে যেন রাত্রে একটি মৃতদেহের সঙ্গে থাকতে বলছি। কিন্তু ওই যে বললাম, এরা হাত দেখার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। এনি থিং মোর ?'

'না। কিছু না। শুধু শেষ প্রশ্ন, ভারতবর্ষের সঙ্গে যখন কয়েকশ' বছর সংযোগ নেই তখন কেন বিজ্ঞাপনে নিজেকে ভারতীয় নারী বলে প্রচার করছেন ?' মাথা নাড়লেন মহিলা, 'স্রেফ ব্যবসার জন্যে। ভারতবর্ষ মানে সাপুড়ে, ম্যাজিশিয়ান এবং জ্যোতিষী, এখবর এরাও জানে। আর আমার শরীরে যখন ভারতীয় রক্ত আছে তখন এ্যাড-ভানটেজটা নেব না কেন ?'

ভদ্রমহিলা দিতে চাইলেও পয়সা নিলেন না। কিন্তু ওঁকে আমি কখনও ভুলতে পারব না। একটি মেয়ে গাড়ি চালিয়ে সন্তান নিয়ে পরবাসে এসে ব্যবসা করছে হাতের রেখা পড়ে কিন্তু মাথা না নুইয়ে, এটা কম কথা নয়। শুধু ভাবিনি এবং ভাবতে ভালো লাগে না, সিন্ধুপ্রদেশ এখন পাকিস্তানে, সেই অর্থে তিনি কোনোমতেই ভারতীয় নন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে সেক্স নিয়ে কোনো গোঁড়ামি নেই এমন গপ্পো কলকাতায় বসে শুনতাম। নরওয়েতে গিয়ে ধারণা পাল্টে গেল। অবশ্য বার্গেন শহরটা নরওয়ের মূল চরিত্রের ব্যতিক্রম হতে পারে। ঠাণ্ডার কারণে কিনা জানি না বার্গেন শহরের মেয়েদের আমার বেশ সংরক্ষণশীল বলেই মনে হয়েছে। কোথাও কোনোও সেক্স শপ দেখিনি, কোনো বিকারের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ে নি। এক ফিনিশ কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এ ব্যাপারে কথা উঠতেই তিনি রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিলেন, 'বড্ড ঠাণ্ডা হে। তবে এস্কিমোরাও তো মাঝে মধ্যে স্নান করে।' ভদ্রলোককে বেশ পছন্দ হয়েছিল।

পঞ্চাশের ওপর বয়স, শুধু কবিতা লিখে বেঁচে আছেন। স্ত্রী চাকরি করেন, দিনরাত মদ খান। এই একটি জায়গায় কবিদের মধ্যে বোধহয় দেশের সীমানা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ভদ্রলোকের নামটা খটোমটো, আজ মনে নেই, বলেছিলেন, 'শরীর টরীর নয় হে, প্রেম চাই প্রেম। মৃত মাছের পেটেও প্রেম থাকে, যদি তা বরফে চাপানো না হয়। কারণ বাসি মাছ কাটলে রক্ত বের হয় না। রক্তের উষ্ণতাই হলো প্রেম। মহিলা যতোই সুন্দরী হোক কাছে গেলে যদি মনে হয় হিমঘরে এলাম তাহলে তোমার প্রেমেরও দফা রফা।'

ফেরার পথে ডেনমার্কের শহর কোপেনহেগেনে নেমেছিলাম দু'রাতের জন্যে। গিয়ে জানলাম ওখানে রাত নামে মাত্র দু'ঘণ্টার কড়ারে। ঘড়িতে যখন রাত বারোটা তখনও ফিনফিনে রোদ চারধারে। যে হোটেলে ছিলাম তার বিছানা পাল্টাতে আসতো একটি বৃদ্ধা। বলত, 'ভারতবর্ষ শুনেছি খুব শান্তির জায়গা। তা এখানে এলে কেন? আমাদের দেশটা এখন বদমায়েশ মেয়েতে ছেয়ে গিয়েছে। খবরদার রাস্তায় এপাশ ওপাশে নজর দিও না।' মহিলা কথা বলতো ভাঙা ইংরেজিতে। ঠিক যেন আমাদের দেশের ঠাকুরমাটি। হোটেল থেকে বেরিয়েই দু'পাশে বিজ্ঞাপন দেখতাম, 'মুক্ত বক্ষ সুন্দরীরা আপনাকে পানীয় পরিবেশন করবেন!' খুব লোভনীয় আমন্ত্রণ, সন্দেহ কি! হোটেলের পঞ্চাশ গজের মধ্যেই ফুটপাথে পাংকদের দেখতাম। খুব বীভৎস চেহারা সব। রাস্তা দিয়ে যারাই যেত তাদের আওয়াজ দিত। মেয়ে পুরুষ সমান। তবে আমেরিকার চেয়ে ওদের পোশাক ও শরীর নোংরায় ঢাকা। ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা বোধহয় তেমন লাগত না! হোটেল থেকে বলে দিয়েছিল এদের পাত্তা না দিতে। দ্বিতীয় দিন দুপুরে খুব খিদে পেয়েছিল। হোটেলের কাছেই একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকে দোকানদারকে পাঁচ ছয় বারের চেষ্টায় বোঝালাম আমি কি খাবার চাই। আমার কাছে ইংরেজি থেকে ডেনিশে অনুবাদ করা

কথাবার্তা চালানোর বই ছিল। কিন্তু রোমানে লেখা ডেনিশ শব্দ উচ্চারণ করে বেশিরভাগ সময়েই বিপাকে পড়েছি! এমন কি যারা ইংরেজি জানে তাদের উচ্চারণও আমাদের থেকে আলাদা। দোকানদার খাবার গরম করতে চলে গেলে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ভাবছি এভাবে একা থাকা খুব কষ্টকর এমন সময় একজন পাংক মহিলা দোকানে ঢুকল। পাঁচ সাত আট লম্বা, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঢোলা হাফপ্যাণ্ট, একটা টাইট সার্ট এবং দুটোই ময়লা, ফর্সা চামড়ায় স্নান না করায় ছাপ স্পষ্ট। আড়চোখে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে বুঝলাম তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে। আর একজন অমন চেহারার পাংক পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভাবতেই অস্বস্তি হয়। হঠাৎ চাপা খসখসে গলা শোনা গেল, কি শব্দ উচ্চারিত হলো বোধগম্য হলো না। আমি তাকালাম না। খাবারটা এলেই বাঁচি। এবার ভাঙা ইংরেজি শোনা গেল,'নো ইংলিশ? হেই মিস্টার?' জবাব দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। না তাকিয়েই বললাম, 'লিট্ল বিট।'

'ওহ্। গিভ মি এ সিগারেট!'

সিগারেট এবং দেশলাই আমার ডান হাতের মুঠোয় এবং হাতটা কাউণ্টারে রাখা ছিল। প্যাকেটটা ওর হাতে দিতে অনিচ্ছা হলো। ওটা খুলে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিলাম। সেটা ঠোঁটে চেপে কোনো অনুরোধ না করেই মেয়েটি দেশলাই নিয়ে নিল আমার মুঠো থেকে। সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম ওর ডানহাতের নখগুলো লম্বা এবং ছুঁচলো। দেশলাইটা যখন জ্বাললো তখন দেখলাম বাঁ হাতের নখ নিটোল কাটা। আমি লক্ষ্য করছি বুঝতে পেরে তিনি বললেন ডান হাত দেখিয়ে, 'ফর প্রোটেকশন।' বলে হাসলেন।

এই সময় আমার খাবার এল। মহিলা আমার কাঁধে টোকা দিলেন, 'আই অ্যাম হাঙ্গরি!' যাচ্চলে। অসহায়ভাবে দোকানদারের দিকে তাকালাম। লোকটা যেন কিছুই শোনে নি এমন ভঙ্গি করে অন্য কাজ

করতে লাগল। মহিলা আমাকে বললেন,'আই নিড ফুড। নো মানি! বাই ফুড ফর মি।'
এবার না বলে পারলাম না, 'হোয়াই?'
'বিকজ আই অ্যাম ওম্যান। আই এ্যাম ফাইভ এইট, ক্রসিং টোয়েন্টি এইট। ব্যাড অর গুড?'
ঠিক এই সময় একটি পাংক ছেলে দোকানে ঢুকল। মেয়েটিকে দেখে সে তার ভাষায় চিৎকার করে গালাগালি দিতে লাগল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে গেল। খাবার খেতে খেতে দুজনের অঙ্গভঙ্গি দেখলাম কারণ ভাষা আমার অজানা। হঠাৎ ছেলেটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে মেয়েটির বুকে মাথা রাখল। যেভাবে গরু তার বাছুরের শরীর চাটে তেমনি করে তিনবার মেয়েটি ওকে চুমু খেল। তারপর হাতের সিগারেটটা ছেলেটিকে দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'হি ইজ গুড। হি বাই ফুড ফর মি। গো ব্যাক। ডোন্ট ওরি।'
লোকটা চোখ মুছল। পাক্কা পাংকের সাজসজ্জা। তারপর সিগারেট হাতে আমার সামনে এসে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করল। 'ইউ আর নট ব্যাড ম্যান?'
হেসে ফেললাম, 'আই ডোন্ট নো।'
লোকটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। এই সময় মেয়েটা তাদের ভাষায় কিছু বলতে লোকটা অট্টহাসি হাসল। যেন আমার রসিকতা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে। আমার পিঠ চাপড়ে সে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে গেল। এবার মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'হি ওয়ান্টস্ টু ম্যারি মি। বাট আই উইল নট ম্যারি হিম।'
খেতে খেতেই সময় কাটাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'
'আমি সাদা চামড়াকে বিয়ে করব না।'
'তাহলে আফ্রিকা বা আমেরিকার কালো মানুষকে পছন্দ কর।'

'না। আমি কালো মানুষকে বিয়ে করব না। ওদের মুখ খুব খারাপ হয়।'

'তাহলে তো তোমাকে চীনাদের বিয়ে করতে হয়।'

'নো। আই লাইক ইওর স্কিন।'

গলায় খাবার আটকে যাচ্ছিল। মহিলা হাসলেন, 'আমি স্নান করলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না। কোন্ হোটেলে উঠেছ তুমি?'

'এ্যাবসন।'

'ওখানে তো আমাদের ঢুকতে দেয় না।'

'ওখানে কেন যাবে তুমি?'

'তুমি তো আমাকে খাওয়াচ্ছ, অতএব কয়েক ঘণ্টা আমরা স্বামী স্ত্রীর মতো থাকতে পারি। কিন্তু ওই হোটেলের দারোয়ান খুব কড়া।'

আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া না গেলা তা বলতে পারব না। দাম মিটিয়ে যখন ফুটপাথে নেমেছি তখন মহিলা আমার পেছনে। প্রথমে নরম গলায় বললেন, 'তুমি বড্ড ভুলো লোক, বললাম না আমি খেতে চাই। সকাল থেকে কিসস্যু খাইনি।'

আমি জবাব না দিয়ে বড় পায়ে হাঁটতে লাগলাম। এবার মেয়েটির ভাষা পাল্টাতে লাগল। আমার পেছন পেছন প্রায় হোটেলের দরজা পর্যন্ত এলো সে। এবং এই পথটুকু পৃথিবীর যতো অশ্রাব্য শব্দ একের পর এক উচ্চারণ করে গেল। আমার ভয় হচ্ছিল অন্য পাংকরা যারা ফুটপাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে তারা না আমার ওপর হামলা করে। কিন্তু তারা শুধু চিৎকার করে মেয়েটিকে উৎসাহিত করছিল মাত্র।

রিসেপশনিস্টকে ঘটনাটি বললাম। তিনি হাসলেন, 'প্রথমেই আপনার বলা উচিত ছিল সিগারেট দিতে পারবেন না। এরা খুব মুডি। প্রস্টিটিউট নয়। ইচ্ছে না হলে হাজার টাকা পেলেও কোনো পুরুষকে চাইবে না। খিদের সময় আপনাকে হয়তো ভালো লেগে

ছিল। তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল, 'দেশে গিয়ে এসব গল্প করবেন না।'

কোনো বঙ্গসন্তান যদি কোপেনহেগেনে যান তাহলে তাঁকে বলব দুটো দিন যেন ত্রিবলিতে কাটান। একটি বিশাল এলাকা জুড়ে নাটক গান বাজনা, ম্যাজিক থেকে আরম্ভ করে সংস্কৃতির দৃশ্যগ্রাহ্য যে কোনো রূপ পরিবেশিত হচ্ছে সারা বিকেল এবং সন্ধ্যায়। বলছি আর একবার, সন্ধে মানে রাত সাড়ে বারোটা। সকাল আড়াইটেয়। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা হবে তার কোনো তুলনা নেই।

হিথরো এয়ার পোর্টে যখন নামলাম বিট্রিশ এয়ারওয়েজে চেপে তখন লণ্ডনের আকাশে সূর্যদেব আছেন। বলতে দ্বিধা নেই, লণ্ডনে নামার সময় আমার মনে বন্দেমাতরম্ মার্কা একটা অনুভূতি কাজ করছিল যা বলছিল এই সেই দেশ যাদের কাছে আমরা দু'শ বছর পরাধীন ছিলাম। ইতিহাসের সত্যিটা তো আমরা মানতে চাই না। আমাদের কোনো মেরুদণ্ড ছিল না, সংহতি ছিল না, একে অন্যের সর্বনাশ চাইতাম আর সেই সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজ। যদিও সতেরশ' অষ্টাশি সালে আমরা যেখানে ছিলাম আজ তা থেকে খুব একটা এগোই নি কিন্তু সৌভাগ্য যেকোনো বিদেশি রাষ্ট্র এই মুহূর্তে দখলের কালো হাত বাড়াচ্ছে না। হিথরো এয়ার পোর্টে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমি কেন এসেছি? হেসে বলেছিলাম, 'এই দেশটাকে ছেলেবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যতটা জানি ততটা ভারতবর্ষকেও জানি না। সেই কারণেই জানার সঙ্গে দেখাকে মেলাতে এসেছি।' লোকটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'এখানে না এসেও এদেশকে জানেন?' মাথা নেড়েছিলাম, 'কি করব বলুন: সেক্সপিয়ার, বায়রন,. শেলি, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডার্বিশায়ার, ল্যাংকাশায়ার, ম্যাঞ্চেস্টার, লর্ডস, লীডস থেকে লেন হাটন, কি জানি না বলুন? ক্লাইভ সাহেব আমাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছেন।'

'কে ক্লাইভ ?'

'রবার্ট ক্লাইভ। ওর মা নিশ্চয়ই বব বলে ডাকতেন।'

'কি করেন তিনি ?'

'করেন না, করতেন! ইস্ট ইণ্ডিয়া নামের এক কোম্পানি ছিল লণ্ডনে। তার হয়ে ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। যাঁর জন্যে শেষ পর্যন্ত আপনাদের ইউনিয়ন জ্যাক আমাদের দেশে উড়েছিল।'

লোকটা কি বুঝেছিল জানি না, চটপট আমার পাশপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে ছেড়ে দিয়েছিল। হিথরো কাস্টমস আমাকে আটকায় নি। স্যুট-কেস নিয়ে যখন বাইরে পা দিয়েছি তখনই পাল এগিয়ে এল, 'আসেন সমরেশবাবু। আমি পাল।'

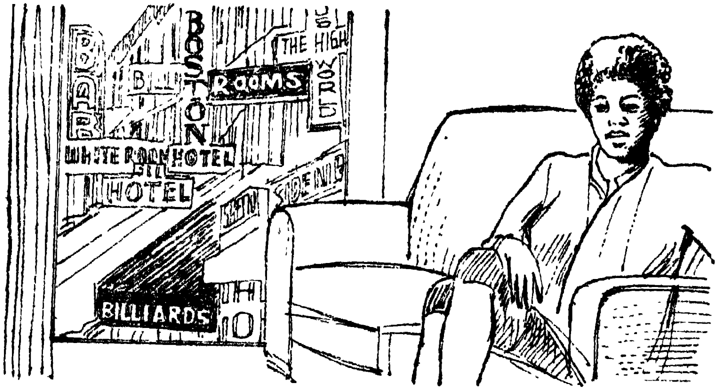
সিলেটি বাংলা শুনেও খুব ভালো লাগল। বললাম, 'আপনাকে দেখে প্রাণ জুড়ালো।'

'থাকলে আবার অন্য ভাবনা ভাববেন। চলেন। আমার গাড়ি বাইরে। আমার লগে একজন তামিল মেয়ে আইছে। সে গাড়িতেই আছে।'

'তামিল মেয়ে ?'

'হ্যাঁ। আমার দোকানে কাজ করত। এখন কেয়ার অফ গ্রেট ব্রিটেন।'





২

আমরা কথা বলতে বলতে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংসের বাইরে আসছিলাম। হিথরো এয়ারপোর্টে পরে আমার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই ফাঁকে সেটা বলে রাখি।

কলকাতা বোম্বাই দিল্লি থেকে সরাসরি বিদেশে যাবার প্লেন পেলে স্যুটকেসগুলো যে এয়ারলাইন্সে যাচ্ছি তাদের কর্মীরাই বোর্ডিং কার্ড দেবার সময় সংগ্রহ করেন। শুধু আমাদের টিকিটের পেছনে একটা ছোট্ট কাগজ সেঁটে দেওয়া হয় প্রাপ্তিস্বীকার চিহ্ন হিসেবে। মাঝপথে প্লেন পাল্টালেও দুশ্চিন্তা করতে তাঁরা নিষেধ করেন, গন্তব্যস্থলে ঠিক স্যুটকেসগুলো পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। বিদেশি এয়ারপোর্টে নেমে লাগেজ নেবার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ফ্লাইট নম্বর অমুকের স্যুটকেস বাক্স বেল্টে চেপে পাক খেতে থাকে সেখানে। যে যার নিজেরটা তুলে নিয়ে কাস্টমস এবং ভিসার ঝামেলা সামলে বেরিয়ে যাও। এই অবধি কোনো বিস্ময় নেই।

কিন্তু ধরুন, বেল্টটা ঘুরছে শ'দুয়েক স্যুটকেস নিয়ে এবং আপনি আপনারটা খুঁজে পাচ্ছেন না। বেশ কয়েকটি এক রঙা এক কোম্পানির স্যুটকেসকে নিজের স্যুটকেস ভেবে ছুটে গিয়ে অন্য যাত্রীর খিচনি খেয়েছেন। এবং শেষত যখন সব ফাঁকা হয়ে গেল তখন আপনি একা দাঁড়িয়ে, তখন কি করবেন? ঐ স্যুটকেসেই আপনার যাবতীয় সম্পত্তি রয়েছে যার অভাবে বিদেশে একদিনও থাকা সম্ভব নয়। হয়তো এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে হলে যে ভারি গরমজামা দরকার তাও রয়েছে ওখানে। কর্তৃপক্ষ বলে থাকেন ওই অবস্থায় আপনার কর্তব্য হলো সংশিলষ্ট এয়ারলাইন্সের এয়ারপোর্ট কাউণ্টারে গিয়ে বিষয়টি জানানো। তারা জেনে একটা ফর্ম দেবেন। বাক্সের সাইজ, রঙ, কোম্পানির নাম, ওপরে যা লেখা ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সেই শহরে আপনার অস্থায়ী ঠিকানা লিখে ফর্ম ফেরত দিলে তাঁরা হেসে বলবেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না, ওটাকে যত শিগগির খুঁজে বের করে আমরা আপনার কাছে পেঁছে দিচ্ছি।' আমি এবং আমার মতন অনেক বঙ্গসন্তান মুখ কালো করে ওঁদের দেওয়া একটা রসিদ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। আমি খবরই রাখিনি স্যুটকেস ওঁদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেলে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ওঁদের। যদ্দিন আমি ওই শহরে থাকব এবং ওঁরা ফেরত দিতে পারছেন না তদ্দিনের জন্যে প্রতিদিনের হারে একটা ভালো অঙ্কের টাকা আমি পাব। আর সব শেষে যদি কখনই স্যুটকেস না পাওয়া যায় তাহলে তার ওজন অনুযায়ী মোটা অঙ্ক আমার পকেটে আসবে। ঠেকে শিখেছি শুধু শার্ট প্যাণ্টে স্যুটকেস ভর্তি তা, হারিয়ে যাওয়ার পর বলতে নেই। অভিজ্ঞরা জ্ঞান দিয়েছেন দামি ভারি ভারি বই আছে বলতে। তাতে ওজন বেড়ে যাবে নির্ঘাৎ। যত ওজন তত ক্ষতি-পূরণ। অবশ্য তারও একটা সীমা বাঁধা আছে। ওই হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে বেল্টের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে

দেখলাম যে যারটা তুলে নিয়ে গেল। শুধু একটি ছোট্ট স্যুটকেস পাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে গেল। ওটা লাগেজরুমে বিশ্রাম নেবে। আমার পরনে তখন একটা স্লিভলেস সোয়েটার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কদম ফুটল। বাইরে নিশ্চয়ই পাঁচ ডিগ্রি, বৃষ্টি হলে কথাই নেই। এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে গিয়ে চেঁচামেচি করতে ওঁরা আশ্বাস দিলেন আগামীকাল পেঁছে যাবে আমার স্যুটকেস। ওরাই সেটা বাড়িতে দিয়ে আসবেন। এনি থিংগ মোর? রসিদ নিয়ে মাথা নেড়ে কাউন্টার ছাড়ার সময় দেখলাম এক বাঙালি ভদ্রলোক পাউন্ড নিচ্ছেন ফর্ম ভরতি করে। গেটের বাইরে এসে যখন ঠক ঠক করে কাঁপছি তখন পেছন থেকে বাংলায় প্রশ্ন এল, 'আপনি ডেইলি এ্যালাউন্স নিলেন না?'

চমকে তাকিয়ে দেখি সেই বঙ্গসন্তান, হাসছেন। মাথা নেড়ে না বলতেই বললেন, 'সেকি মশাই, গৌরী সেনের টাকা ছাড়বেন কেন!' তখন আমি জানলাম। বোঝা গেল পৃথিবীর সব দেশেই দাবি না করলে কেউ নিজে থেকে হাতে তুলে কিছু দেয় না। কিন্তু এখন আর ফিরে গিয়ে চাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমি কাস্টমসের চত্বর পেরিয়ে এসেছি। ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আপনি একি করেছেন। একটা হাফ স্লিভে, ভারি কিছু স্যুটকেস থেকে বের করে নেন নি কেন?'

'আমি কি জানতাম ওটা এখানে এসে পাব না!' সত্যি কথাটাই বললাম।

'প্রথম বুঝি!' ভদ্রলোক হাসলেন।

স্যুটকেস হারাবার পর কেউ এভাবে হাসতে পারে? বললাম, 'না। আপনি কোলকাতার?'

'এককালে। এবার বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'আপনারও স্যুটকেস হারিয়েছে?'

'না।'

ঠাণ্ডা-ফাণ্ডার কথা ভুলে গিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। একটু আগে এই ভদ্রলোক ক্লেইম ফর্ম ভর্তি করে কাউণ্টারে চোটপাট করে এসেছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ আজকের দিনের জন্যে হাতখরচ নিয়েছেন। অথচ এখন বেমালুম বলছেন তাঁর স্যুটকেস হারায়নি। অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে যে ওখানে—।'

ভদ্রলোক বললেন, 'শুনুন মশাই, আমি থাকি লণ্ডন থেকে দেড়শ' মাইল দূরে। ওই স্যুটকেস বয়ে নিয়ে টিউব স্টেশনে যেতে হতো। সেখান থেকে শহরের মাঝখানে। আবার ট্রেন বদলাও। স্টেশন থেকে আমার বাড়ি আড়াই মাইল ভেতরে। গাড়ি বলা নেই। অতএব স্যুটকেসের জন্যে ট্যাক্সি করতে হতো। এত কষ্ট না করে হারিয়ে গেছে বলে দিলাম। ওরাই খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত এখানকার লাগেজরুমেই পাবে মালটাকে। আগামীকাল লোক দিয়ে ওদের খরচায় আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। মাঝখান থেকে আমি এখন যাচ্ছি ঝাড়া হাত পায়ে, পকেটে কয়েকটা পাউণ্ডও এসে গেল উপরি।'

'আপনি আপনার স্যুটকেস বেল্টে দেখেও তুলে নেননি?'

'না। এখানে কেউ কারো জিনিস নেয় না, আমারটাও নেবে না।'

'ওরা যাচাই করে দেখবে না সত্যি আপনারটা হারিয়েছে কিনা!'

'দেখবে না। কারণ প্লেনে উড়ে এসে নিজের স্যুটকেস দেখেও হাত সরিয়ে নেবে এমন মানুষের সংখ্যা দশহাজারে একজন। আপনারটা যাচাই করল? করল না। আরে আমি মশাই বেসিক্যালি ভবানীপুরের ছেলে, এসব কায়দা কানুন আমার জানা আছে।' ভদ্রলোক হাত দুলিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে লাগলেন। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। একমাত্র বঙ্গসন্তান ছাড়া এমন সুবিধেবাদী চিন্তা আর কার মাথায় আসে, জানি না!

পাল-এর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আর আকাশের তলায় এসে

দাঁড়াতেই মনে হলো খুব চেনা জায়গায় এসেছি। লণ্ডন মানে মেঘ, টিপটিপে বৃষ্টি, স্যাঁতসেতে ব্যাপার স্যাপার—এই চেনা বর্ণনাটা হুবহু মিলে গেল। মেঘগুলো এত কাছে ভাসছে যে উল্টে পড়লেই ভিজে যাব। রাস্তা ডিঙিয়ে গাড়ির দঙ্গল পেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম,'মেয়েটি কেয়ার অফ গ্রেট ব্রিটেন মানে?' পাল গম্ভীর গলায় বলল, 'পরে বলব। এসে গেছি।'

সিলেটের লোক দীর্ঘকাল লণ্ডনে থাকলেও কোনো অসুবিধে বোধ করে না। কারণ লণ্ডনেও ছোটখাটো সিলেট রয়েছে। তাঁদের কথার টান, শব্দের ব্যবহার স্পষ্ট করে যে আমরা যে ভাষাটাকে বাংলা বলে জানি তার সঙ্গে খুব যোগাযোগ নেই। কিন্তু কলকাতার বাঙালি পেলে এঁরা কথা বলতে চেষ্টা করেন কৃত্রিমভাবে যাতে অতিথির কোনো অসুবিধে না হয়। সিলেটিরা যখন নিজেদের মধ্যে বাংলা বলেন তখন সেটা কলকাতার বাঙালির কানে ডেনমার্কের ভাষা বলেও বোধ হতে পারে। পাল আমার সঙ্গে কথা বলতেন ওই সতর্কভাবে। কিন্তু যেটা হলো সেটা বেশ মজার। আমি কোনোদিন পূর্ববাংলার মানুষ না হয়েও দ্রুত ওঁর কথা বলার ভঙ্গিটাকে নকল করে ফেললাম। এতে উনি খুশি হলেন। আর আমি একটা দুটো সিলেটি শব্দ শিখে ফেললাম।

চেহারা দেখে মনে হলো পালের গাড়িটি যথেষ্ট মূল্যবান। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। ডিকি খুলে আমার স্যুটকেস সেখানে তুলে দিয়ে পাল বলল, 'ইংলণ্ডে প্রথম?' 'হ্যাঁ।' শরীরে ভারি জামা থাকায় ঠাণ্ডা লাগছে না। কিন্তু নাক জমতে শুরু করেছে। 'ভালো করে জাতটাকে দেখে নিন। আমাদের চাকর করে রেখেছিল।'

পালকে দেখে আমার মোটেই স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বলে মনে হয় নি। কিন্তু এই কথাগুলোতে ঝাঁঝ লক্ষ্য করলাম। গাড়িতে ওর পাশে বসার পর আরাম হলো। চমৎকার গরম হয়ে আছে ভেতরটা।

কোমরে বেল্ট বেঁধে জ্যাকেট খুলে ফেললাম। পাল এবার মুখ ফিরিয়ে ডাকল, 'মানি, হেই মানি। গেট আপ।'

অবাক হয়ে দেখলাম পেছনের সিটে যে উপুড় হয়ে শুয়েছিল সে এবার উঠে বসল। স্বাস্থ্যবতী বেঁটেখাটো কালো চেহারার ভারতীয় মেয়ে। মাথা ভর্তি কোঁকড়ান চুল যা কাঁধের সীমা ছুঁইয়েই থেমে গেছে। ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা চোখে মেয়েটি সরল হাসল, 'হাই।'

পাল পরিচয় করিয়ে দিলো,'এই হলো মানি। ইনি মিস্টার মজুমদার।' মানি আমাদের শহরে থাকে, একা। আগে আমার রেস্টুরেণ্টে চাকরি করত। এখন আকাশ থেকে প্যারাসুটে চেপে লাফ দেয়।'

মানি পালের ইংরেজি শুনে খিলখিল করে হেসে বলল, 'ওঃ, ডোণ্ট সে লাইক দ্যাট। ওয়েল, আমি আগে চাকরি করতাম। এখন করি না। সরকার আমাকে বেকারভাতা দেয়। একটা ফ্ল্যাট দিয়েছে। তাতেই চলে যাচ্ছে যখন তখন কেন কাজ করতে যাব। আর কাজ করলে তো বেকার-ভাতা পাব না। প্যারাসুট জাম্পের ব্যাপারটা হলো,আমি সপ্তাহে দু'-দিন ওই ট্রেনিং নিচ্ছি। খুব থ্রিল লাগছে। না, না, চাকরি পাওয়ার জন্যে নয়। এমনি, ভালো লাগে, তাই। তবে ডাক্তার বলে দিয়েছে সামনের মাস থেকে ওটা করা চলবে না।' মানির ইংরেজি ভারতীয়দের মতো। প্রতিটি শব্দ আলাদা করে চেনা যায়। পাল ততক্ষণে গাড়ি বের করেছে পার্কিং লট থেকে। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'মানির বাবা মা থাকেন ইংলণ্ডের আর এক প্রান্তে। ওঁরা মাদ্রাজের লোক। মানি জন্মেছে এখানে। এখন এদেশের নাগরিক, তাই বেকার ভাতা পাচ্ছে।'

'এখানে বেকারের সংখ্যা কম?'

'তুলনামূলকভাবে। তবে বাড়ছে। নাগরিক হলে এসব সুবিধে পাওয়া যায়।' তারপর বাংলায় বলল, 'শালা, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় বেকার পুষছে, ভাবুন।' রাগটা সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে। যদ্দুর জানি

পালও ব্রিটিশ নাগরিক। বছর কুড়ি আছে এখানে। একটা রেস্টুরেণ্ট আছে। অবস্থা খারাপ বলেই ট্যাক্সের কথা বলল।

এদেশের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের দেশে রাস্তাঘাট, ব্রিজ তৈরি করেছিল। আমরা সেগুলোর প্রশংসা আজও করে থাকি। এই সেদিনও শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার পথে তিস্তার ওপরে সেবক করোনেশন ব্রিজ দেখে আমার এক নবীন বন্ধু চমকিত। বলে-ছিল, ব্রিটিশরা যা করে রেখে গেছে তারপর বুঝলেন, খুব একটা এগোয়নি।' আমি যতই বলি ওই ব্রিজ তৈরির সঙ্গে একজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার জড়িত ছিলেন সেটা সে কানেই তুলছিল না। এয়ারপোর্ট থেকে পালের গাড়ি যখন বেরিয়ে আসছিল তখন আমি কিছু মুগ্ধ হচ্ছিলাম না। আধা অন্ধকার করে আসা মেঘ দেখে মন খারাপই হয়ে যাচ্ছিল। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে নিউইয়র্কের দিকে যাওয়ার সময় যে বিস্ময় ছিল হিথরোতে তা নেই। পালের কাছে শুনলাম আমরা লণ্ডন শহর এড়িয়ে যাব।

যাব বোস্টনে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে। চার ঘণ্টার ড্রাইভ। হাইওয়ের চেহারা অবশ্য অনেকটা আমেরিকার মতো। মাথার ওপরে পথ-নির্দেশক বোর্ডগুলো অথবা পাশের হোটেল রেস্টুরেণ্ট পেট্রল পাম্পের সাইন-গুলো বলে দিচ্ছে নতুন মানুষদের কোনো অসুবিধে হয় না এখানে। এখন আমার দু'পাশে ধু-ধু প্রান্তর। কখনও চাষের মাঠ কখনও গরুদের অলস বিচরণ। এইসব গরু, যেমন বিলিতি ছবিতে দেখেছি, বিশাল স্বাস্থ্যবান চেহারা, চকচকে কালোয় সাদায় মেলানো। ইংরেজি কবিতায় এই খামারবাড়ির বর্ণনা খুব পেয়েছি। হাইওয়ের পাশাপাশি লেন দিয়ে হুসহাস গাড়ি চলছে। তাদের চেহারার পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। আমাদের গাড়ির সবকটা জানলা বন্ধ। পেছনের সিটে মানি আবার শুয়ে চোখ বন্ধ করেছে! মেয়েটা এত ঘুমোয় কেন? হঠাৎ পাল বলল, 'বলুন তো কত মাইল স্পিডে আমরা যাচ্ছি।'

আড়চোখে মিটার দেখলাম। একশ' দশ-পনেরর মধ্যে ঘুরেছে ওটা। এবং তখনই খেয়াল হলো ইংলণ্ডে কিলোমিটার চালু নয়। ওঁরা এখনও মাইলেই আছেন। অর্থাৎ ওখানে যদি একশ কুড়ি তাহলে ভারতবর্ষের কিলোমিটারে তা একশ' আশি। সঙ্গে সঙ্গে শরীর হিম হয়ে গেল। অথচ ওটা দেখার আগে বুঝতেই পারিনি যে একশ' আশিতে আমি যাচ্ছি। বোকার মতো হাসলাম। পশ্চিমবাংলার কোনো ড্রাইভার একশ' কুড়িতে গাড়ি তোলার চেষ্টা করলে এ্যাকসিডেণ্ট অনিবার্য। অথচ রাস্তার কল্যাণে পাল স্বচ্ছন্দে একশ' আশিতে যাচ্ছে। পাল জিজ্ঞাসা করল, 'আরও স্পিড তুলবো ?' আমি দ্রুত জবাব দিলাম, 'না।'

ইংলণ্ডে এসে বোস্টনে যাওয়ার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। বড় বড় শহরে রাস্তায় হাঁটা যায়, মিউজিয়ম আর গ্যালারি দেখা যায় কিন্তু সারাক্ষণ মানুষের সঙ্গে জম্পেস আড্ডা মারা যায় না। শুনে-ছিলাম বোস্টন একটা ছোট্ট শহর, সবাই সবাইকে চেনে এবং পাল ওখানে খুব পরিচিত। ওঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা এখন দেশে বেড়াতে গিয়েছে। অতএব ওঁর কাছে হাত পা মেলে থাকার এবং মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদেশে আপনার অনেকদিন হয়ে গেল ?'

পাল মাথা নাড়ল। লোকটার মুখে সবসময় একটা রহস্যময় হাসি মাখানো থাকে,'বেকার এসেছিলাম। রেস্টুরেণ্টে কাজ করতাম। লণ্ডনে। তারপর একজনের সঙ্গে শেয়ারে রেস্টুরেণ্ট করলাম। শেষে এই বোস্টনে। অনেকদিন তো হয়ে গেল। তবে আর ভালো লাগে না। এ শালার দেশে মন পাই না। আই অ্যাম প্ল্যানিং টু গো ব্যাক ইণ্ডিয়া।'

ওয়াশিংটন থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে রমেন পাইন দুঃখের কথা বলেছিলেন। মনোজ বলেছিল, বেশিরভাগ বাঙালি আপনাকে একা পেলে দেশের জন্যে কাঁদবে কিন্তু দেখবেন কেউ দেশে পাকাপাকি ফিরবে না।' ওর এই বিশ্লেষণ সত্ত্বেও আমার মনে হয়ে-

ছিল রমেনের কষ্টটা খুব খাঁটি। আর আজ পাল যখন একই কথা একটু মোটা ভাষায় ইংলণ্ডের হাইওয়েতে বলল তখন ধন্ধ লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেশে গেলে যে যে সুবিধে এখানে পাচ্ছেন তা কি পাবেন ?'

'মারেন গুলি সুবিধের মাথায়। পাউণ্ড গুনি, বাড়ি বানাই আর ইংরেজি শব্দগুলো চিবাই। আরে মশাই, বউ-এর সঙ্গেও কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'কেন ?' আমি কি কোনো গল্পের গন্ধ পাচ্ছিলাম ? জানি না।

'কি কথা বলব। ছ'মাসে সব কথা শেষ। এখন সে-ও জানে আমার জীবন কি আমিও জানি তার কথা। যাই বলেন, পিসিমা মাসীমা না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কোনো বৈচিত্র্য আসে না। শালা এক রান্না এক শোওয়া বসা। বাড়ির বাইরে গিয়ে কারো সঙ্গে মন খুলে অন্য কথা বলার উপায় নেই। পুরুষগুলো টাকা ছাড়া অন্য কথা বলে না, মেয়েগুলো শোওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে জানে না। আই অ্যাম ফেড আপ। বলেন তো, আমি কেন চার ইণ্টু দুই ঘণ্টা ড্রাইভ করে আপনাকে নিতে এলাম এয়ারপোর্টে ?' পাল রাগি মুখে তাকাল। সত্যিই তো, কেউ ঘাটশিলায় নামলে আমরা কলকাতা থেকে তাকে আনতে যাই না। তাঁকেই বলি ট্রেন ধরে চলে আসুন হাওড়া স্টেশনে, সেখানেই যাচ্ছি। পালই জবাব দিলো,'মুখ বদলাবার জন্যে। আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলব। যে ক'দিন থাকবেন একটু বেপরোয়া হয়ে থাকেন। ডিসিপ্লিন মেনে মেনে একদম ভিজে গেছি মশাই। মাল খাই না তিন বছর। স্ত্রীর শাসন। চরিত্র ঠিক রেখে শুধু টাকা রোজগার করে গেলে লোকের, মানে দেশের লোকের হাততালি পাবে। আরে আমি কি মেশিন নাকি ?'

এবার মনে হলো,মনোজের বোধহয় ভাবনাটায় ফাঁক ছিল। এমন খোলা-মেলা কথা যে বলে তার মধ্যে ন্যাকামি নেই। সেইসঙ্গে আশান্বিত

হলাম, যে জীবন আমাকে পাল যাপন করতে বলছে এখানে তাতে আর যাই হোক নিষেধের লাল চোখ নেই।

ন্যাড়া মাঠ বা গোচারণভূমি পেরিয়ে আচমকাই একটা শপিং কমপ্লেক্স চোখের সামনে উঠে এল। এপাশে পেট্রল পাম্প, কিছু কেনাকাটার দোকান এবং রেস্টুরেন্ট। আর কোনো বাড়িঘর ধারে কাছে নেই। গাড়ির গতি কমিয়ে পাল জিজ্ঞাসা করল, 'কফি খাবেন?' মনে হলো মন্দ হয় না। দেখলাম গোটা আটেক গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে। হাইওয়ের খদ্দেরদের জন্যে এই তিনটে ব্যবস্থা। গাড়ির দরজা খুলে নিচে পা দিতেই পৃথিবীর নবম বিস্ময়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি আমার কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না! ওপাশের কোনো গাড়ির টেপ রেকর্ডারে বাজছে 'যৌবনে আজ মৌ জমেছে বউ কথা কও ডাকে।' ইংলণ্ডের এই নির্জনতম হাইওয়ের পাশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। এবং সেই গান যা আমাকে যৌবন চিনিয়েছিল? কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। তিনটে গাড়ির পরে গানের উৎসটিকে আবিষ্কার করলাম। গাড়ির কাচ নামানো। তাই শব্দাবলী বাইরে বেরুচ্ছে। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে কেউ নেই। কিন্তু তার পাশের সিটে একটি মধ্যবয়সী মহিলা একমনে গান শুনতে শুনতে বই পড়ছেন। এবং পাঠক, মহিলাটি পুরোপুরি ব্রিটিশ। এটি দ্বিতীয় চমক। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গানটা শুনলাম। কয়েক শ' বার শোনা গান এই পরিবেশে নতুন হয়ে বাজল যেন। তারপরেই ইন্দ্রাণী ছবির সেই গান, 'সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো।' মুহূর্তে আমি চলে গেলাম সেইসব রাতে যখন জলপাইগুড়ির ওপরে চমচমে জ্যোৎস্না হিমে মাখামাখি। শহর নিশ্চুপ। আর আমি, এই আমি, পিতামহকে লুকিয়ে বিছানায় পাশবালিশ রেখে ওপরে লেপ চাপা দিয়ে রূপশ্রী হল থেকে নাইটশো দেখে চোরের মতো ফিরছি। স্কুলের শেষ ক্লাসের ছাত্র হয়েও সেই জ্যোৎস্নার রাত্রে আমার গলায় হেমন্ত মুখার্জি

আর মনে সুচিত্রা সেন একাকার হয়ে যেতেন। আমি হাঁটতাম ঘোরে, আর ঘুম ঘুম চাঁদের সেই মাধবীরাতটা হয়ে উঠত আরও মায়াময়। ঈশ্বর সময় পাননি নজর দেবার তাই কখনও পিতামহের কাছে ধরা পড়িনি। কিন্তু যে রোমান্টিকতার বীজ বপন হয়ে গিয়েছিল সেই সময়ে তার মূল্য দিতে হলো অনেক বছর।

'ইয়েস জেন্টলম্যান, এনি প্রব্লেম ?'

চমকে পেছন ফিরে দেখি এক রোগা সাহেব বেশ কয়েকটা প্যাকেট হাতে নিয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। হেসে বললাম, 'সমস্যাটা আমার একারই। আপনি বাংলা জানেন ?'

'না। ওঃ, আই সি ! আপনি বাংলাদেশের লোক ?'

এই প্রভেদটা বোঝাতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। মাথা নেড়ে বললাম,'বাংলা জানেন না অথচ বাংলা গান শুনছেন। রেকর্ডটা পেলেন কোথায় ?'

'লন্ডনে। কেন জানি না সুর আর ভয়েস আমার ভালো লাগে। ইন ফ্যাক্ট, আমি গানের কথাগুলোর মানে জানি না।' ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে মহিলাকে প্যাকেটগুলো দিলেন। বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। পাল আর মানি দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজাতে বাজাতে গাড়িটা আবার হাইওয়ের দিকে চলে গেল। কেন জানি না মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়িয়ে যখন আমরা বোস্টনে ঢুকছি তখন ঘড়িতে চার ঘণ্টা পার হব হব কিন্তু মেঘ কেটে গেছে। পরিষ্কার ছবির মতো রাস্তাঘাট। পাল মানিকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলো। ছ'তলা ফ্ল্যাট বাড়িগুলোয় বোস্টনের বেকাররা থাকেন। মানি শরীর বেঁকিয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে বিরাট একটা'বাই'বলে আমাদের বিদায় জানাল। পাল বলল স্টিয়ারিঙ ঘোরাতে ঘোরাতে মানি মেয়েটা বেসিক্যালি ভালো। কিন্তু ওকে এখানকার ইন্ডিয়ান মেয়েরা ভালো চোখে দ্যাখে

না।'

'কেন?'

'প্রথম কথা একা থাকে। দ্বিতীয় ব্যাপার ও নিজেই প্রচার করেছে, মা হতে যাচ্ছে।'

'মা হতে যাচ্ছে মানে? বিয়ে থা?'

'দরকার মনে করে নি। অনেক বৃটিশ মেয়ে করে না। বেকারভাতা নিতে আরম্ভ করার পর ওর তো চাকরি করা নিষেধ। সরকার ওকে এর মধ্যে গোটা তিনেক চাকরির অফার দিয়েছে আর ও যেকোনো একটা কারণ ঘটিয়ে চাকরিগুলো পায় নি। তারপরেই মনে হলো কনসিভ করলে এক দেড় বছর আর সরকার থেকে চাকরি করার চাপ দেবে না। মনে হওয়ামাত্র কাজটা সেরে নিল!'

'ছেলেটির সঙ্গে ওর প্রেমট্রেম ছিল না?'

'একেবারে না বলাটা ভুল হবে। ওই বয়সের মেয়ের সঙ্গে অনেকেরই প্রেম থাকে। ইউরোপ আমেরিকায় ষোল বছর পেরিয়ে গেলেই মেয়েরা ডেটিং শুরু করে। আর ডেটিং মানে তো শুধু হাত ধরাধরি করে বেড়ানো নয়। শোওয়াটা যে একটা শিল্প তাই হাতে কলমে শেখা হয় আর কি। কিন্তু মায়েরা বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে যতই ডেটিং করো এই বয়সে মা হয়ো না। অবশ্য শুনছে কে? বেশিরভাগ বৃটিশ মেয়ে কাজটা ষোল সতেরর মধ্যে চুকিয়ে বাকি জীবনটা ঝাড়া হাত পা হয়ে থাকে।'

'বাচ্চাটাকে মানুষ করে কে?'

'ঠাকুমা। তাছাড়া অনেক ক্রেশ আছে। একটু বয়স হলে বিয়ে থা করে নেয় মিলসই কোনো ছেলে পেলে। বাইশ বছর পর্যন্ত ভার্জিন আছে এমন মেয়ে বোধহয় বিজ্ঞাপন দিয়েও পাওয়া যায় না। পেলেও তার বর জুটবে না। তা এদের সঙ্গেই তো বড় হয়েছে মানি। ওর মানসিকতায় ইণ্ডিয়ান ভাবনা নেই। গায়ের চামড়া দেখে যদি কেউ ওকে বিচার

করতে যায় তো ভুল হবে। আমি মানিকে সাপোর্ট করতে গিয়েছিলাম বলে কত কথা শুনতে হয়েছে।'

হঠাৎ মাথায় প্রশ্নটা এল, 'আচ্ছা পাল, আপনার মেয়ে যদি এমন কাণ্ড করত তাহলে কি আপনি তাকে সাপোর্ট করতেন ?'

পাল আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ! এদেশের বাঙালিরা মেয়ে পনেরয় পড়লেই ঘন ঘন দেশে যায় পাত্র খুঁজতে। সেই মেয়ে যদি দেশে বিয়ের পর থাকে তাহলে ফিফটি পার্সেণ্ট কেসে ডিভোর্স অনিবার্য। কারণ তার পনের বছরের জীবনে যেসব সংস্কার দ্যাখেনি তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। আর যারা এখানে পছন্দ মতো বিয়ে করে তারা কিছুটা আরামে থাকে। লণ্ডনে আমার এক আত্মীয় আছে। মেয়েটি টিভিতে অভিনয় করে। একা থাকে। বাঙালি। বাচচার মা হবার বেশ কিছু পরে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে।'

বললাম, 'আপনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন !'

'দেখুন, যে মেয়ে বিয়ে থা না করে মা হয় সে জানে কি করে নিজেকে সামাল দিতে হবে। কাজটা করে ফেলে মা বাবার কাছে এসে কান্না-কাটি করে বলে না বাঁচাও। একটি মেয়ের ব্যক্তিগত জীবনে তার মা বাবার কোনো ভূমিকা নেই। ধরুন পাত্র পছন্দ করে বিয়ে দিলেন বাপ মা। বিয়ের ছ'মাস পরে জানতে পারলেন ছেলেটি মেয়ের কোনো অভাব রাখে নি শুধু কোনোদিন তাকে স্পর্শ করে নি। অথচ ওর ব্যবহার, জীবনযাত্রা খুব ভালো। এক্ষেত্রে বাবা মা কি ছেলেকে ডেকে উপদেশ দিতে পারেন আমাদের দেশে ? তাই যে মুহূর্তে মেয়ে বিয়ের আগে অমন কাজ করে ফেলবে সেই মুহূর্তে আমার দায়িত্ব শেষ। আমার মেয়ে হলেও। আমি তাকে নিশ্চয়ই ইমোশনালি হেল্প করব কিন্তু তার বেশি নয়। তাকে কনডেম করে আমি নিজে তো কিছু লাভ করছি না। পাল হাসল, 'এসব বলছি কারণ আমার নিজের কোনো মেয়ে নেই। এটা আপনি ভাবতে পারেন। তবে সময় যে দিকে

বয়ে যাচ্ছে আমি তার বিপরীতে গেলে ক্ষতিটা আমরাই। তাই না?' দু'পাশে মাঝারি সাইজের বাড়ি, উঁচু নিচু রাস্তা এবং রাস্তাগুলো রেডরোডের মতো পরিষ্কার, শহরের মাঝখান দিয়ে চলছি আমরা। দু'পাশের ফুটপাতে কোনো লোকজন নেই। কলকাতায় যদি ফুটপাত ধর্মঘট হয় তাহলে এইরকম চেহারা হবে। একটা বাঁক নিয়ে ঢালুর দিকে গড়াবার মুখে ব্রেক চাপল পাল, 'আমার রেস্টুরেন্ট। বাঁয়ে।' 'এখন খোলা?' বাইরের দেওয়ালে দোতলা সমান জায়গায় সাইন-বোর্ড চোখে পড়ল। ভারতীয় খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ।

'হ্যাঁ। আজ ভোর চারটে পর্যন্ত খোলা। দিনেরবেলায় বন্ধ থাকে। রবি থেকে বৃহস্পতি একদিন বাদে সন্ধে সাতটা থেকে এগারটা। শুক্র আর শনি ভোর পর্যন্ত। আমি আসব দশটা নাগাদ। চলুন আগে বাড়ি যাই।' যেতে যেতে পাল বাঁ দিক ডান-দিকে যা আছে তার বর্ণনা দিচ্ছিল, রেস্টুরেন্ট থেকে ওর বাড়ি বেশি দূরে নয়। পেছনের গলিতে গাড়ি রেখে আমায় নিয়ে সামনের দরজায় এল সে। চাবি খুলে একটা সরু প্যাসেজ। ডান হাতে পড়ার ঘর। তারপরই বসার ঘর। পাশ দিয়ে দোতলার সিঁড়ি চলে গেছে। সে আমাকে নিয়ে দোতলায় চলে এসে শোওয়ার ঘর দেখাল। বাথরুম চেনালো। তারপর জিজ্ঞাসা করল কিছু খাবো কিনা? ইচ্ছে ছিল না। পাল বলল, 'ফ্রেস হয়ে নিচে আসুন। আমি ডিনার তৈরি করছি।'

বাড়িতে আর লোকজন নেই। খুব আরাম লাগল।

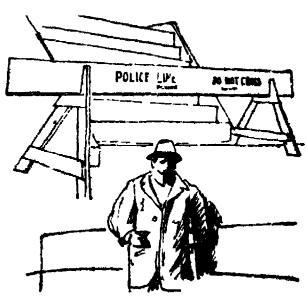
বাথটবে শরীর মেজে ঘষে জামাকাপড় পালটে নিচে এলাম। ওঠার নামার সময় কার্পেট থাকতেও সিঁড়িতে বেশ শব্দ হয়। বসার ঘরে ঢুকে দেখলাম পাল নেই টিভি চলছে। ওপাশের দরজা খোলা। সম্ভবত সেটাই কিচেন। পাল সেখান থেকে মুখ বের করে বলল, 'আপনি আড় মাছ খান?'

'আড় ?' হেসে বললাম, 'আমার কোনো কিছুতেই আড় নেই।'

'যাক। কলকাতার বাঙালিরা আড়, বোয়াল খায় না শুনেছি। আড় বানাচ্ছি, সঙ্গে ফুলকপি, ডাল ভাজা, আর ভাত। চলবে ?'

'ফাস্টক্লাস।'

আমি টিভির দিকে তাকালাম। বি বি সি খবর বলছে। ইংলণ্ডের সমস্ত হিপিরা একজায়গায় জড়ো হয়ে হাইওয়ে ধরে এগোচ্ছে কয়েকটা দাবি নিয়ে। ওদের থামাবার জন্যে পুলিশ তৎপর। সঙ্গে সঙ্গে স্পটে চলে গেল ক্যামেরা ম্যান।





৩

আমেরিকায় গিয়ে আমার মনে হয়েছিল হিপিদের দিন শেষ। আর কোনো ছেলে সংসারে বৈরাগ্য এলে হিপিদের দলে নাম লেখায় না কারণ সেই দলটাই আর নেই। আমেরিকায় এখন হিপিদের জায়গা নিয়েছে পাংকরা। তাদের শাখা দেখে এসেছি ডেনমার্কেও। কিন্তু বি বি সি-র সংবাদপাঠক বললেন প্রায় দু'হাজার হিপি ইংল্যাণ্ডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলেছে মিছিল করে। শুধু বলা নয়, তাঁদের ক্যামেরাম্যান ঘটনাস্থল থেকে ছবি পাঠাতে আরম্ভ করলেন। গাড়ি ক্যারাভান সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাইওয়ের ওপর। পুলিশ তাদের পথ আটকেছে। চেহারা দেখেই লোকগুলোকে বাউণ্ডুলে যাযাবর বলে মনে হয়। কোট ছেঁড়া, মাথায় কারো কারো বিবর্ণ টুপি। কারো হাতে গীটার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। বাচ্চা-কাচ্চাও দেখছি আছে সঙ্গে। আর আছে প্লাকার্ড তাতে পুলিশের বিরুদ্ধে নানারকম স্লোগান লেখা এবং সেই সব স্লোগানে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে জেহাদ জোরদার করতে। সংবাদপাঠক বলে

যাচ্ছেন হাইওয়ে জুড়ে চলা এই মিছিল ট্র্যাফিকের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করছে। আমাদের প্রতিনিধি হিপিদের নেতার সঙ্গে কথা বললেন। ক্যামেরা এবার একটি হুড খোলা জিপের ওপর চলে এল। সেখানে একজন প্রবীণ হিপি দাঁড়িয়ে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বি বি সি-র প্রতিনিধি বললেন,'হেই মিস্টার,আমাদের শ্রোতারা তোমাকে দেখছে। তুমি কি কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে?' লোকটা রাগী গলায় বলল, 'ওদের মধ্যে কি কোনো মিনিস্টার আছে?' 'আছেন। তোমরা কেন এই মিছিল বের করেছ?'

'প্রতিবাদ করতে। আমরা হিপিরা খুব শান্ত। কিন্তু পুলিশ অকারণে আমাদের হয়রানি করছে। মিথ্যে কেস সাজিয়ে আমাদের জেলে পোরে। আমাদের অনেকেই বেকারভাতা পেত, কিন্তু ইদানীং সরকার আর মুঠো খুলছে না। এইসব বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমরা না খেয়ে মরব? পুলিশ আমাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করে তা নাৎসিরা দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় ইহুদিদের সঙ্গে করত। আমরা পৃথিবীর মানুষকে ব্যাপারটা জানাতে চাই।'

'এই যে এত গাড়ি ক্যারাভান, এগুলো আপনাদের?'

'বোকার মতো কথা বলো না। অন্যের জিনিস হলে পুলিস এতক্ষণ আমাদের বাইরে রাখত না। কিন্তু ওরা ভেবেছে কি। এর মধ্যে ওদের আদেশে আমরা তিনবার রুট বদলেছি। সোজা পথ ছেড়ে এত ঘুর পথে ওরা আমাদের যেতে বাধ্য করছে যে আমাদের তেল ফুরিয়ে যাবে, পকেটের টাকাও শেষ হয়ে যাবে। আর নয়, আমাদের সোজা পথে যেতে না দিলে এখানেই বসে থাকব!

'এই মিছিল করে কি লাভ হচ্ছে আপনাদের?'

'আমরা মৃত মানুষ নই তাই প্রমাণিত হচ্ছে।'

এই সময় একজন হিপিনী কোলে বাচ্চা নিয়ে ছুটে এল জিপের সামনে। এক হাত আকাশে তুলে চিৎকার করে উঠল, 'আমার এই

বাচ্চাটা আজ সারা দিন এক ফোঁটা দুধ পায় নি। ও যদি মরে যায় তাহলে বৃটিশ সরকার দায়ী থাকবে। বৃটেনের সব মা এই কথাটা জেনে রাখুন।'

ব্যাপারটা ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হয়েও আমার কাছে নতুন। এই সরকার বিরোধী জেহাদ ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি আমাদের দেখানো হচ্ছে। ভারতবর্ষের সরকারি আমলারা মন্ত্রীদের ভয়ে ব্যাপারটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। দিল্লি টিভি যদিও বা মাঝেমধ্যে সরকার বিরোধী সমালোচনাকে জায়গা দেয়, কিন্তু 'তামসে'র মতো সিরিয়াল যদি বাংলাভাষায় তৈরি হতো তাহলে কলকাতার কর্তারা তা টেলিকাস্ট করতে সাহস পেতেন না। এখানে কোনো রাজনৈতিক ঐতিহাসিক সত্য বলা নিষেধ, বর্তমানের কথা তো দূরে থাক। আজ অবধি কলকাতা টিভি দার্জিলিঙ-এর আন্দোলন নিয়ে একটা কথাও বলে নি যতদিন না ঘিসিং চুক্তিপত্রে সই করেছে। এ্যাদ্দিন কলকাতার টিভি দেখে মনেই হতো না দার্জিলিঙ-এ কিছু ঘটছে। সরকার শাসিত দূরদর্শন বলেই মন্ত্রীরা যা ভাবেন আমলারা তার বহুগুণ করে থাকেন।

বি বি সি-র প্রতিনিধি এবার ঘটনাস্থলে দাঁড়ানো পুলিশের বড় কর্তার কাছে চলে গেলেন, 'স্যার, ওরা আপনাদের গালাগাল দিচ্ছে।'

'কিছু করার নেই। আমি ওদের, এক ঘণ্টা সময় দিয়েছি। যদি তার মধ্যে রুট না পালটায় তাহলে এ্যারেস্ট করতে হবেই।' পুলিশের কর্তা চিউংগাম চিবোচ্ছিলেন। 'কিন্তু আপনি কেন ওদের বারংবার রুট পালটাতে বলছেন?'

'আমি না। আদালত। ওরা যেসব গ্রামের সামনে দিয়ে যাবে ইতিমধ্যে আদালতে গিয়ে ইংজাংশন নিয়ে এসেছে সেইসব গ্রামের লোকজন যাদের হাইওয়ের পাশে জমিজমা আছে। আদালত বলে দিয়েছে তাদের জমিতে হিপিরা রাত কাটাতে পারবে না। এরা বাচ্চা নিয়ে সারারাত

চলবে না। রাত কাটাতে জমিতে নামবেই। আর আদালতের হুকুম মানতে আমাকেই বাধা দিতে হবে সেই সময়। ওই অপ্রিয় ঘটনাটা ঘটুক তা আমি চাই না। সেই জন্যে ওই পথে যেতে দিচ্ছি না।'

'যে রুটে যেতে বলছেন সেখানেও তো একই ঘটনা ঘটতে পারে।'

'না। এখন আদালত বন্ধ হয়ে গেছে। আর সবাই জানতো এই রুটে ওরা যাবে না। তাই ইনজাংশন নেয়নি।' অফিসার চিউংগাম চিবানো থামালেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, এভাবে আমাদের হয়রানি করে ব্যাটাদের কী লাভ হচ্ছে।'

এর পরেই এক গ্রামের খামারবাড়ির সামনে এল বি বি সি-র ক্যামেরা। খামারের বৃদ্ধ কর্তা চিন্তিত মুখে বলে, 'হ্যাঁ, আমি ইনজাংশন নিয়েছি। আমার জমিতে হিপিরা নামতে পারবে না। কেন নিয়েছি? আরে ওরা তো সব নোংরা জীব। এখানে রাত কাটালে সকালে জমিটার দিকে তাকাতে পারব না। তাছাড়া ভোর বেলায় দেখব গ্রামের কারো বউ কারো মেয়ে ওই হিপিদের দলে ঢুকে পড়েছে। সরকারকেও বলিহারি, আমাদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় ওইসব নোংরা জীবকে পুষছে। উই মাস্ট প্রটেস্ট।'

শুধু সংবাদ নয়, ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি তিন পক্ষের বক্তব্য প্রচার করার মানসিকতা আমাদের দূরদর্শন কবে দেখাবে জানি না।

এই সময় পাল ঘরে এল। তার রান্না শেষ। টেবিল সাজিয়ে লজ্জিত মুখে বলল, 'আজ মেনুটা ভালো হলো না। কাল আপনাকে ইলিশ মাছ খাওয়াবো।' এই সময় টেলিফোন বাজল। পাল বলল, 'ধরেন তো।' বলে রান্নাঘরে চলে গেল।

রিসিভার তুলে হেলো বললাম। ওপাশ থেকে যা শুনলাম তার বিন্দু বিসর্গ বুঝলাম না। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে পালকে ডাকলাম। সে দ্রুত চলে এল। মিনিট খানেক সে ওই ভাষায় কথা বলল। দু-একটা শব্দ অনুমানে বুঝতে পারছি। অবশ্য তাড়াতাড়ি

বলার কারণে জটিলতা বেড়েছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে পাল বলল, 'চিকেন কাবাব বাড়িয়ে দিয়ে চিলি ফিস কমাতে বললাম।'

'কাকে ?'

'আমার রেস্টুরেন্টের চিফ কুককে। আপনি আমাদের কথা বুঝতে পারেন নি, না ? সিলেটি ভাষার এই সুবিধা, বাঙালিরাও বুঝতে পারে না।' পাল হাসেন। পিসিমার আদরে বড় হওয়ার সময় আমাকে কখনও রান্নাঘরে ঢুকতে হয়নি। পরিচিত অনেক পুরুষকেই দেখেছি চমৎকার রান্নাবান্না করে থাকেন। তাঁদের স্ত্রীরা নিশ্চয়ই খুব খুশিতে থাকেন। সমর্থনে বলা যায় পৃথিবীর সব বিখ্যাত হোটেলের রাঁধুনিরা পুরুষ, রাজা নবাবদের ভালো রান্না করে দিত পুরুষরাই। এখনও বাবুর্চিরা আছেন। চালসার পি ডব্লু ডি বাংলোর বাবুর্চির রান্না তো কোনোদিন ভুলতে পারব না। এমন কি আমাদের বন্ধু মদন গুহ তোপচাঁচিতে যে মাংস রেঁধেছিল তার তুলনা নেই। কিন্তু আমার রান্না করাটা আজও হয়ে উঠল না। সবার তো সব হয় না। একবার বিখ্যাত নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর ছেলে হাবুলদার কাছে লিখিতভাবে পেয়েছিলাম মোগল সম্রাট হুমায়ুনের প্রিয় মাংসের পদটি কিভাবে তৈরি হতো। বিকেল তিনটের সময় সেটি যখন উনুন থেকে নেমেছিল তখন আমার ছাড়া কারোরই দ্বিতীয়বার ছুঁয়ে দেখার প্রবৃত্তি হয় নি। আমার এক বন্ধু এক কন্যাকে খুব ভালবাসত। কন্যা আধুনিকা, চাকুরিরতা, স্বাধীনচেতা এবং মমতাময়ী। সেই কন্যার ভালবাসা প্রার্থী ছিল আর একজন পুরুষ। জিমন্যাস্টিকে যেমন বিভিন্ন প্রতিযোগীর লম্ফঝম্পের সাফল্যের ওপর পয়েন্টস কাউন্ট করা হয় কন্যা এভাবেই দুজনকে মনে মনে পয়েন্টস দিতেন। আমার বন্ধুর দিকে পাল্লা বেশি ঝুঁকছিল। কন্যা একা থাকতেন। একদিন তিনি ঈষৎ জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই তার কাজের লোক হঠাৎ ডুব মেরেছিল। বন্ধু গিয়ে

দেখলেন সকাল থেকে অসুস্থ কন্যার কিছু খাওয়া হয় নি। তিনি তখনি বাস ধরে ধর্মতলা চলে এলেন। তারপর বিভিন্ন দামী রেস্টুরেণ্টে ঘুরে ঘুরে জ্বরের মুখে যা যা খেতে ভালো লাগে আগে তা সংগ্রহ করে প্রফুল্ল মনে কন্যার বাড়িতে ফিরে গেলেন। গিয়ে আবিষ্কার করলেন কন্যার জ্বর বেশ কমে গিয়েছে। বন্ধুর আনা খাবার দেখে তিনি অখুশি হলেন না, কিন্তু জানালেন যে সেই দ্বিতীয় পুরুষটি এসেছিল এবং তাঁর অবস্থা দেখে চটপট সুস্বাদু কিছু খাবার তৈরি করে তাঁকে খাইয়ে দিয়ে চলে গেছে। এবং এই একটি ঘটনায় চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হয়ে গেল বন্ধুর। মেয়েরা সেবা করতেই ভালবাসে, সেবা নিতে নয়, এই ফর্মুলা শরৎচন্দ্র শিখিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েরা যখন মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর তখন ফর্মুলা অচল হবেই। তবে ওই যা বলেছি, কারো কারো আর সব করা হয়ে ওঠে না।

পালের হাতের রান্নাটি চমৎকার। বিলেতের এক আধা শহরে রাত্তির বেলায় ধনেপাতা লাউ ইত্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে এটা আরও ভালো। খাওয়া দাওয়ার পরে পাল ফল নিয়ে এল। এ জীবনে খাওয়ার পর ফলের অভ্যেস হয় নি যখন তখন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। পাল বলল, 'যদি আপনার ঘুম পায় তাহলে শুয়ে পড়ুন আর তা নাহলে আমার সঙ্গে বেরোতে পারেন।'

খাওয়াদাওয়ার পর এক ধরনের আরাম ছড়ায় শরীরে। বললাম,'আপনার রেস্টুরেণ্ট তো দেখে এসেছি। একটু পরে ঠিক পেঁছে যাব।'

একদম সাহেবি পোশাক পরে পাল চলে গেল। খালি বাড়িটায় আমি একা। বিদেশি বাড়িগুলোতে একটা মিষ্টি গন্ধ সবসময় ঝোলে। আমি চারপাশে তাকিয়ে কোনো বইপত্তর পেলাম না। একবার মনে হলো শুয়ে পড়লে কেমন হয়। কিন্তু পায়ের তলায় যার সরষে সে এই রাত্রে ঘুমাবে এমন তো হওয়ার কথা নয়। সেজেগুজে ঘড়িতে

সময় দেখলাম,সাড়ে এগারটা। যাওয়ার আগে সদরের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেছে পাল।

এই রকম ছিমছিমে শীতের রাত্রে ইংল্যাণ্ডের একটি বাড়িতে আমি একা। আমার কাছেপিঠে পরিচিত মানুষের মুখ নেই, আত্মীয়, বন্ধু অথবা বন্ধুর মুখোশধারীদের নিঃশ্বাস পড়ছে না পিঠে। হঠাৎ মনে হলো যে সব মানুষ অনেক ভাবে তাদের বড় কষ্ট। যারা তাৎক্ষণিক ব্যাপার নিয়েই মগ্ন থাকে তারা বরং ভালো আছে। সকালবেলায় বাজার, দুপুরে অফিস, সন্ধ্যায় ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আর রাত্রে ঘুমের বাইরে যাদের জীবন নেই তারা সুখী। কিন্তু যাদের মনে হয় এইভাবে বেঁচে থাকার কোনে মানে হয় না, এই একই কাজ করতে করতে বড় হওয়া এবং বুড়িয়ে যাওয়া, একঘেয়েমিতে যারা আক্রান্ত হন তাঁদের মতো দুঃখী জীবদের নিয়েই গোলমাল। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'পঞ্চাশ বছর পৃথিবীতে রয়েছেন, এমন কি নতুন কিছু করে গেলেন যা আপনার পিতা করেন নি?' সে কিছু উত্তর দেবার চেষ্টা করে ঘেমে গিয়েছিল। অনেক সময় ইচ্ছে হয় কলকাতার কোনো মধ্যবয়সী মানুষকে তুলে নিয়ে ফিনল্যাণ্ডের একটি শহরে বসিয়ে দিয়ে বলি, 'ভুলে যান আপনার নাম হরিদাস পাল, স্টেট ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার কেরানি, রোজ সকালে কলেজ স্ট্রীটে বাজার করেন, অফিসে যান আর বাড়ি ফেরেন। মনে করুন এখন আপনি টম ডিক বা হ্যারি, আপনার পেছনে কেউ নেই, সামনে বাকি জীবন পড়ে আছে। ফিনল্যাণ্ডের এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন।' প্রস্তাব শুনে কেউ কেউ বলেছেন, 'যেহেতু লোকটা বাঙালি তাই শেকড় কাটার দুঃখেই মরে যাবে, কারণ নতুন শেকড় গজাবার ক্ষমতা তার নেই। তবে ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকায় পাঠাবেন না। এখানে ভারতবর্ষ পেয়ে গিয়ে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দেশ থেকে শেকড়বাকড় তুলে আনবে চটপট।'

বস্তুত আমেরিকা যতটা নয় ইংল্যান্ড এখন অনেক বেশি এই সমস্যায় ভুগছে। আগে ওরা এয়ারপোর্টে এশিয়ানদের কাছে ভিসা দেখতে চাইত না, এখন আগে ওটা যাচাই করে জেনে নেয় কদিনের মধ্যে দেশে ফিরে যাওয়া হবে। ইংল্যান্ডে একজন আধা শিক্ষিত ভারতীয় পৌঁছে গেলে তার বিদেশ বলে মনে হয় না। ভাষার সমস্যা নেই, খাবার-দাবার সব পাওয়া যায়। শুনেছি লন্ডনের টেলিফোন ডাইরেক্টরির বেশ কয়েকটা পাতা প্যাটেলরা দখল করে রেখেছে। লন্ডনের রাস্তায় নাকি পাঁচজনকে ধরলে একজন ভারতীয় পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে যেসব বৃটিশ দেশে ফিরে গিয়েছিল তারা এখন হাঁপিয়ে উঠছে চারপাশে ভারতীয় দেখে। লন্ডনের কর্পোরেশন ইলেকশনে ভারতীয়রা জিতেছে। ওদের সন্দেহ গোপনে এইভাবে ভারতীয়রা বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদটার জন্যে এগোচ্ছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা থেকে কানপুরে বদলি হওয়ার সঙ্গে লন্ডনে আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই মেয়েলি গলা পেলাম, 'পাল, তুমি এখনও বাড়িতে? ভালো হলো। আমার এক বান্ধবী এসেছে এ্যাবসন থেকে। ওকে ইন্ডিয়ান ফুড খাওয়াবো ভাবছি। তুমি কি বল?'

জড়ানো ইংরেজির সবকটি শব্দের মর্ম বুঝতে পেরেছি বলেই তো মনে হলো। অতএব আমার ভারতীয় গলা জানতে চাইল, 'আপনি কে বলছেন?' 'মাই গড! এটা কি পালের টেলিফোন নয়?' ওপাশে বিস্ময়!

'একশবার পালের টেলিফোন। কিন্তু সে এখন নেই। আপনি যদি নামটা দয়া করে বলেন তাহলে ওকে জানিয়ে দিতে পারি।'

'ও কোথায় গিয়েছে?'

'রেস্টুরেন্টে।'

'আমি ভাবিনি ও এত তাড়াতাড়ি কাজে বের হবে। বাই।' টেলিফোন রেখে দিলেন মহিলা। সম্ভবত অচেনা মানুষকে নিজের পরিচয় দিতে চাইলেন না।'

পাল খেতে বসে বলেছিল বড্ড চুরিচামারি হয় এখানে। সাদারাই বেশি চুরি করে। টাকা-পয়সা যদি সঙ্গে নিয়ে বেরোতে না চাই তাহলে শোয়ার ঘরে কার্পেটের তলায় রেখে যেতে পারি। সাহেব চোরের নজর অত নিচে সাধারণত নামে না। এ বাড়িতে এর আগে কয়েকবার চুরির চেষ্টা হয়েছে।

কার্পেট সরিয়ে তার তলায় পাউণ্ড এবং ট্র্যাভেলার্স চেকের বইটা রাখতে গিয়ে মনে হলো সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ হলো। অথচ আমি নিজে বাইরের দরজাটায় লক তুলে দিয়ে এসেছি। আওয়াজটা একবার হয়েই থেমে গেছে। তাহলে কি জঙ্গলের পথে সাপ সাপ ভাবতেই সাপ চলে এল। জীবনে কখনও চোরের মুখোমুখি হইনি। পুলওভার শরীরে থাকা সত্ত্বেও কেমন শীত শীত করতে লাগল। কার্পেটটা নিঃশব্দে টান টান করে তার ওপরে দাঁড়ালাম। এইরকম টাকার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতাও এই প্রথম। কান খাড়া করে আছি অথচ আর কোনো শব্দ হচ্ছে না। চোর কি নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসছে? নাকি টিভির ঘরে ঢুকেছে? যে দেশে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড টিভি বিক্রি হয় না সে দেশের চোররা টিভি চুরি করবে কেন?

যতটা সম্ভব শব্দ না তুলে নিচে নামতে চাইলাম। কিন্তু এবাড়ির সিঁড়ি এমনভাবে তৈরি যে পা রাখলেই সারা বাড়িতে ঝনঝনানি ওঠে। মনে হয় চোর যদি ঢুকেও থাকে সে ওই শব্দে সতর্ক হয়ে পালিয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম সব কটা জানলা দরজা বন্ধ। কারো পক্ষে ভেতরে কিছু না ভেঙে আসা সম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হলো ওপরে যে ঘরটায় আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে কেউ

হাঁটছে। চোর চিন্তা ছাপিয়ে যিনি মাথায় এলেন তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে একা থাকা প্রথম রাতেই আমার পক্ষে অসম্ভব।

বাইরে বেরিয়ে মনে হলো দৌড়োতে পারলে ভালো হয়। ঠাণ্ডা যেন অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরেছে আমাকে। পুলওভারের ওপর জ্যাকেট ছিল বলে রক্ষা। প্যাণ্টের তলায় আজ ড্রয়ার পরিনি। বোকামি করেছি কিন্তু বাড়িতে ফিরে সেই চেষ্টা করার ইচ্ছা নেই তা ঠাণ্ডা যত তীব্র হোক না কেন! রাস্তা নির্জন। দোকানপাট বন্ধ। যে রাস্তা দিয়ে পালের সঙ্গে গাড়িতে এসেছিলাম সেটাকে মনে রেখে এগোতে লাগলাম। ঠাণ্ডায় কিনা জানি না, রাস্তার আলো-গুলোকে হলদে দেখাচ্ছে। পেট্রল পাম্প পর্যন্ত একটি মানুষকেও দেখতে পেলাম না। বারংবার দেখে নিচ্ছি কোন্ পথ দিয়ে এগোচ্ছি। যদি পালের রেস্টুরেণ্টে না পৌঁছতে পারি তাহলে পথ হারিয়ে ফেললে আর দেখতে হবে না।

এবার হুস হাস গাড়ি যাচ্ছে। তে-মাথার মোড় এটা। পালের গাড়ি কোন্ দিক দিয়ে বাঁক নিয়েছিল ভাবার চেষ্টা করলাম দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে। একটু এগোতেই নিওন সাইন দেখতে পেলাম। রনি'স পাব, বার্ডল্যাণ্ড, চার্লি'স ক্যাসিনো, ডিসকো ক্লাব। এইগুলো হয় রেস্টু-রেণ্ট নয় মদ বিক্রির জায়গা। রাস্তাটায় উঠে আসতেই দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়েরা এক একটা দোকানে ঢুকে যাচ্ছে। এই সময় একটা তীব্র সিটি শুনলাম সেই সঙ্গে হেঁড়ে গলায় গান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের দেখলাম। গোটা তিনেক নিগ্রো ছেলে আর দুটি সাদা মেয়ে। পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে ফুটপাত জুড়ে হাঁটছে চিৎকার করতে করতে। ভালো করে দেখে বুঝলাম এরা পাংক কিংবা হিপি নয়। নিছক মজা করার জন্যেই এইরকম চিৎকার চেঁচামেচি। একটা ট্র্যাফিক সিগন্যালের স্ট্যাণ্ডকে নিগ্রো ছেলেটি এমনভাবে লাথি মারল যে সেটা মুখ থুবড়ে পড়ল। সঙ্গিনী চিৎকার

করল হেসে উঠে, 'হেই সামওয়ান ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার।' ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, 'হু ইজ হি ? পিটার ? হেই পিটার, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং হিয়ার ? অ্যাক্টিং ফর দ্যা কপস ?'

প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ছেলেটা আমার সামনে এসে আঙুল নাড়ল। আমি জানি একটু প্রভোকেশন পেলেই ছেলেটি মারপিট শুরু করে দিতে পারে। হেসে বললাম, 'লুকিং ফর সামওয়ান হু ক্যান গিভ মি কম্পানি।'

ছেলেটা গলার ভেতর থেকে 'অ্যাঁ' জাতীয় একটা শব্দ বের করে মুখ ফেরাল! 'হেই গার্লি, হি ইজ এলোন।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ওয়েল, উই কান্ট হেল্প ইউ জেন্টলম্যান। উই আর বিজি।' ওরা রাস্তা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল। এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম ছেলেগুলোর পরনে জিনসের প্যান্ট আর জিনসেরই জ্যাকেট। মেয়ে দুটোই প্যান্টের ওপর রঙিন গেঞ্জি পরেছে। এই শীতে আমি যখন কুঁকড়ে যাচ্ছি তখন ওরা ওই পোশাকেই বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব দেখলে টেখলে মনে হয় আমাদের বয়সটা সত্যি বাড়ছে।

পাকের রেস্টুরেন্টের নিচে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা থেকে সিঁড়ি সোজা ওপরে চলে গিয়েছে। সিঁড়ির মুখে নিওন সাইন জ্বলছে নিভছে। মাঝ পথ অবধি উঠেছি সঙ্গে সঙ্গে ওপরের দরজা খুলে গেল। একজন স্বাস্থ্যবান ইংরেজ আমাকে আপ্যায়ন করল, 'হেলো। কাম ইন প্লিজ'।

লোকটার নাম বিগ জন। পরে জেনেছি ওর কাজ হলো সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ হলে দরজা খুলে আপ্যায়ন করা। এদের বলা হয় ডোর ম্যান। সাদা বাংলায় যাদের দারোয়ান বলা হয় তাদের সঙ্গে এদের একটু পার্থক্য আছে। যেসব ছেলে বেশীদূরে পড়াশোনা করতে পারে না অথচ শরীর চর্চায় মন দেয় তাদের একটা ক্লাব

আছে। সেই ক্লাবের শরীর চর্চার সঙ্গে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি রেস্টুরেন্টে, ক্লাবে, পাবে এদের চাকরি দেওয়া হয়। এরা যেমন দরজা খুলে খদ্দেরকে আপ্যায়ন করে তেমনি শান্তি রক্ষা করে। ডোরমেন ক্লাব এদের পেছনে আছে। কোনো ডোরমেন যদি শান্তিরক্ষার সময় বিপাকে পড়ে তাহলে পলকেই ক্লাব থেকে সাহায্য এসে পড়ে। যেহেতু এরা আইন ভাঙে না তাই পুলিশ সব সময় এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। খদ্দেররা সাধারণত এদের ঘাঁটায় না। বরং এদের ব্যবহারে মেয়েরা খুব খুশী হয়।

বিগ জন দরজাটা খুলে ধরে রেখেছিল, আমি ভেতরে পা দিলাম। ডান দিকে বিশাল ফ্লোরে টেবিল পাতা। সাদা ধবধবে টেবিল চাদর, প্রতিটিতে কাঁচের পাত্রে মোমবাতি জ্বলছে। সুবেশ খাদ্য সরবরাহ-কারীরা ব্যস্ত এখন। প্রায় সব টেবিলই ভর্তি। আর অত্যন্ত মৃদু স্বরে ভেসে আসছে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান, 'এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার।' বিগ জন বলল, 'পল বলেছিল তার এক গেস্ট এসেছে,আপনিই কি তিনি?' মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই বিগ জন একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো,'দিস ইজ জন, বিগ জন, ডোর ম্যান হিয়ার।' লোকটাকে ভালো লাগল। নিজের নাম বললাম। দুতিনবার চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে যদি সাম বলে ডাকি তাহলে কি খুব আপত্তি করবে?' 'মোটেই না।'

'তাহলে এখানে এই সোফায় বসো। দুটো কথা বলি। আমার ডিউটি তো এই দরজায়। এখান থেকে নড়তে পারব না। ভদকা উইদ টনিক চলবে? ওটাই আমার ড্রিঙ্ক। সানি, হেই সানি, দুটো ভদকা উইদ টনিক।' যে তরুণটিকে ডেকে বিগ জন হুকুম দিলো তাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে পালকে দেখলাম। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়ল কাজ করতে করতে। বিগ জনের পাশে বসলাম। সামনেই একটা পাবলিক টেলিফোন। রান্না হয় নিচে। ওপরে

স্টোর। দোতলা থেকে ইণ্টারকমে খাবারের অর্ডার পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিচে। খাবার তৈরি হলেই একটা বেল বাজে। কপিকলে বাঁধা ট্রেতে চেপে খাবার উঠে আসে ওপরে। ওয়েটাররা সেটা তুলে নিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করছে। এখানে একমাত্র ভরতীয় মোগলাই খাবার পরিবেশিত হয় বলে মনে হচ্ছে। তবে চিলি ফিস কতটা মোগলাই তা আমার জানা নেই। টুকটুকে ফর্সা একটি তরুণ ট্রেতে করে দুটো গ্লাস নিয়ে এসে আমায় বলল, 'হেলো'। বিগ জন বলল, 'এই হলো সানি। খুব ভালো ছেলে। কিন্তু মুস্কিল হলো ওর চেয়ে চার বছরের বড় একটা মেয়ে ওকে বিয়ে না করে ছাড়বে না বলছে।'

সানির মুখে রক্ত জমল, 'হ্যাট্,' এসব কথা বলবে না। আমি বিয়ে করবই না। তুমি পলের বন্ধু ? ইণ্ডিয়া থেকে এসেছ ?'

'ঠিক তাই।'

'তুমি সানি গাভাসকারের খেলা দেখেছ ?'

'নিশ্চয়ই।'

'হি ইজ এ গ্রেট প্লেয়ার। না কি ?'

'অবশ্যই।'

'আমি ওর ফ্যান। তাই নিজের নাম সানি রেখেছি।' বলতে না বলতেই সিঁড়িতে শব্দ হলো। বিগ জন চটপট উঠে দরজা খুলে আপ্যায়ন করল। বিশালদেহী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সোনালী চুলের সুন্দরী ললনা ভেতরে ঢুকলেন। 'হাই জন, হাই সানি।' দুজনের দিকে দুবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিগ জন এবং সানি সেই বাড়ানো হাতের আঙুলে চুম্বন করল। বিগ জন মহিলার ওভারকোট খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলো। বিশালদেহী বললেন, 'আমার টেবিলে লোক বসিয়েছ কেন সানি ? দিস ইজ ব্যাড। হোয়ার ইজ পল ?' সানি চটপট জবাব দিল, 'আপনারা আজ একটু আগে এসে পড়েছেন স্যার। পল কাউণ্টারে আছে।' বিশালদেহী সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আগে এসেছি আমরা ?' সুন্দরী হাসলেন, 'তাছাড়া রোজ এক টেবিলে বসতে আমার ভাল্লাগে না ।' বিশালদেহী বললেন, 'ইন্স-পায়ার্ড হলাম । আমি তো ভেবেছিলাম ওই টেবিলে না বসতে পারলে তুমি রেগে যাবে । টেবিল চেঞ্জ কর কিন্তু ডোণ্ট চেঞ্জ ইওর ম্যান ।' মহিলা হেসে বিশালদেহীর বাহু জড়িয়ে সানির প্রদর্শিত পথে এগিয়ে গেলেন । বিগ জন গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবার আমার পাশে বসল, 'হি ইজ এ ব্যাঙ্কার । খুব দিলদরিয়া মানুষ । প্রত্যেক সপ্তাহে দুদিন খেতে আসেন । বিল মেটানোর পর কখনও চেঞ্জ ফেরত নেন না । গুড ফ্রেণ্ড অফ পল ।'

'ওঁর স্ত্রীও বেশ মিষ্টি ।'

'আরে না না, লিজা ওঁর স্ত্রী নয় । লিজার স্বামী লণ্ডনে থাকে । এই দুদিন ওরা একসঙ্গে ডিনার খায়, রাত্রে থাকে । ব্যাস ।'

এত সহজ গলায় বিগ জন কথাটা বলল যে আমার বিষম লাগার উপ-ক্রম । হঠাৎ রেস্টুরেণ্টের ভেতরের কোনো টেবিল থেকে চিৎকার ভেসে এল । কেউ খুব রেগে গিয়েছে । বিগ জন গ্লাস রেখে দিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে । এবং তখনই চিৎকার থেমে গেল । ফিরে এসে গ্লাস হাতে নিয়ে বিগ জন বলল, 'বুঝলে কেউ কেউ চমৎকার কথা শোনে । বউ খেতে চাইছে স্বামী নিষেধ করছে এই নিয়ে চিৎকার । গিয়ে বললাম, 'আপনি ভদ্রলোক এটা ভুলে যাবেন না ।' সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল ।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ পরিস্থিতি ফেস করতে হয়েছে এর আগে ?'

'হ্যাঁ, অনেকবার । দাঁড়াও, ডাক্তার আসছে । খুব নাক উঁচু খদ্দের । খিটকেল বুড়ো । গ্লাস রেখে দিয়ে দরজা খুলে হাসি মুখে আপ্যায়ন করল বিগ জন । শুঁটকো চেহারার এক বৃদ্ধ, আপাদমস্তক মুড়ে ভেতরে ঢুকলো । বিগ জন ওঁকে ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল ।

বৃদ্ধ চারপাশে নজর বুলিয়ে বললেন, 'আজ দেখছি বেজায় ভিড়। আর একটা ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্ট খুলেছে শহরে কিন্তু সেখানে মাছি তাড়াচ্ছে। হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট থেকে পালের খাবার নিয়মিত পরীক্ষা করছে তো? কিছু মিশিয়ে খদ্দের টানছে কিনা কে জানে?' বিগ জন বলল, 'আপনি নিজে ডাক্তার, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া কি সম্ভব?' উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ টেবিলে বসব! না, না, অন্যের সঙ্গে টেবিল শেয়ার করতে পারব না আমি! তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি জীবনটাকেই কারো সঙ্গে শেয়ার করিনি। একদম স্টিল ব্যাচেলার আমি।'

বিগ জন ওঁকে একটা খালি টেবিলে বসিয়ে দিতেই রেস্টুরেণ্টে আর জায়গা রইল না। ফিরে এসে বিগ জন বিপদে পড়ল। যে আসছে তাকেই অনুরোধ করতে হচ্ছে সোফায় বসে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে। বুঝলাম এখন আর আমাদের গল্প জমবে না। সোফা ছেড়ে উঠে এলাম কাউণ্টারের দিকে। পাল বলল, 'ভেতরে চলে আসুন।' সরু প্যাসেজ দিয়ে কাউণ্টারে চলে আসতে মদের বোতল দেখতে পেলাম। নানান চেহারার বোতল আর হরেকরকম নাম। পাল সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'এগুলো সবই স্কচ। সাতানব্বুই রকমের মদ আছে আমার কাছে। প্রত্যেকটা টেস্ট করে দেখুন।'

'একদিনে সাতানব্বুই'?

'আহা, যে কদিন আছেন সেই কদিনে। আজ বিজনেস খুব ভালো। বিগ জনের গল্প শুনলেন? খুব ভালো লোক। এসব কথা পাল বলছে ক্যাশমেমো কাটতে কাটতে অথবা পাউণ্ডে নোট গুনতে গুনতে, 'আপনার নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে লাগছে।' 'মোটেই না। ওহো, আপনার একটা ফোন এসেছিল। ভদ্রমহিলা তার বান্ধবীকে নিয়ে খেতে আসবেন কিন্তু নাম বললেন না।'

পাল কাঁধ নাচাল কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় নিল না বলে মনে হলো।

এবার পালের ডাক এল যে টেবিল থেকে সেই টেবিলেই বিশালদেহী ব্যাঙ্কার বসে আছেন। এই প্রথম ওকে কাউণ্টার ছেড়ে যেতে দেখলাম। লক্ষ্য করেছি প্রতিটি কর্মচারী খেটে যাচ্ছে হাসি মুখে। চারজন ওয়েটারের মধ্যে দুজন ভারতীয়। কথা বলে বুঝলাম ভুল আমার, ওরা বাংলাদেশী। একজন ওয়েটার এসে আমাকে জানাল পল ডাকছে।

ব্যাঙ্কারের টেবিলে পেঁছানো মাত্র তিনি চওড়া পাঞ্জা বাড়িয়ে হাত মেলালেন, 'ইউ আর পল'স গেস্ট, সুতরাং এই শহরের গেস্ট। আপনি তাজমহল দেখেছেন?'

'হ্যাঁ'।

'আমি সামনের শীতে তাজমহল দেখতে যাব। মমতাজ বেগম খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'আমি দেখিনি। ছবিতে সব মেয়েকেই সুন্দরী লাগে।'

ভদ্রলোক হোহো করে হেসে উঠলেন, 'সাবাস। আচ্ছা, এই মহিলা তো আপনার সামনে জ্যান্ত বসে আছেন, এঁকে আপনার কি মনে হয়? সুন্দরী?'





৪

এইরকম প্রশ্নের সামনে কি আমি কখনও পড়েছি ? ভদ্রমহিলা প্রায় সুচিত্রা সেনের হাসি এঁকে রেখেছেন ঠোঁটে। চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আলতো শব্দ করে হাসলেন, 'কই জবাব দিন! ও আমাকে বলছে তাজমহল দেখতে যাবে। সেটা নাকি আমার চেয়ে সুন্দরী এক মহিলার সমাধি। তাই ? আমি তো বললাম, মমতাজ বেগম কয়েক'শ বছর আগে জন্মেছিল, তাঁকে দেখবার কোনো সুযোগ আমার পাওয়ার কথা নয়। সে সময় ফটোগ্রাফি ছিল না। রাজা-বাদশার বেগমদের ছবি যেসব শিল্পী আঁকতেন তাঁদের প্রাণের দায়ে সুন্দরী করে তুলতে হতো। অতএব তুলনা আসে কী করে ?' এই অবধি বলে হাঁপ ছাড়লাম। এরকম ফ্যাসাদে কখনও পড়িনি। আর মানুষও যেমন, ইংল্যাণ্ডের একটা আধাশহরে মাঝরাতে মৃত বেগমের সঙ্গে রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জ্যান্ত মানুষ ছাড়া আর কেই বা নামে ? সুন্দরী ব্রাডিমেরির গ্লাস তুলে আলতো চুমুক দিলেন, 'তুলনা করতে হবে না। আমি শুনেছি ভারতবর্ষের মেয়েরা খুব সুন্দরী। মিসেস

ইণ্ডিরা গান্ডীকে দেখেই তো বোঝা যায় কথাটা খুব সত্যি। আমি কি তাদের শ্রেণীতেও পড়ি না ?'

বিশালদেহী ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন। পাল ক্যারি অন গোছের কিছু বলে ফিরে গেল তার কাজে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'আমরা যখন এখানে এলাম তখন আপনি দরজার সামনে সোফায় বসেছিলেন। ওঁকে নিয়ে যখনই আমি কোথাও যাই তখনই লক্ষ্য করি আশ পাশের মানুষের প্রতি-ক্রিয়া কী! বিগ জন আর সানি যখন ওঁর আঙুলেচুমু খেল তখন ওঁকে মনে মনে স্তুতি করল। কিন্তু আপনার চোখেমুখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাইনি। হয়তো আপনি বড় অভিনেতা তাই বুঝতে পারিনি। এখন বলুন,ঈশ্বর যদি আপনাকে এক রাত্রের জন্যে কোনো সঙ্গিনীকে নির্বাচন করতে বলেন তাহলে আপনি কি লিজাকে নির্বাচন করবেন ?

লিজা হেসে উঠলেন খিলখিলিয়ে, 'বাঃ, খুব মজার ব্যাপার হবে।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'ওটা যদি আমার জীবনের শেষ রাত হয় তাহলে আমি একা থাকতে চাইব। কারণ মেয়েরা আমার সব কিছু গোলমাল করে দেয়।'

লিজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যেমন ?'

বললাম, 'ধরুন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হলো। আমরা অনেক স্বপ্নের কথা বলাবলি করলাম। তার হয়তো সিগারেট পছন্দ হয় না, আমি ওটা ছাড়া থাকতে পারি না। সে হয়তো লেট নাইট করতে ভালবাসে আমি চাই না। কিন্তু দু'জনে দু'জনকে না দেখে থাকতে পারছি না। একটা সময় শেষ পর্যন্ত এল যখন আমরা একত্রিত হতে পারছি। আর সেই সময় মেয়েটি বলল, সে খুব খুশি হবে যদি একা থাকতে পারে। কারণ সে বুঝতে পারছে জীবন সম্পর্কে যে ভাবনা সে ভাবে তার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। দুম করে আণবিক বোমা ফাটল আমার সামনে। আমি খুব দুঃখিত

হয়েছি দেখে সে হাত নেড়ে বলল,'মুস্কিল হলো তোমার সঙ্গে কোনো যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করা যায় না।' এই মেয়েটি কিন্তু আমাকে ডিচ্ করে অন্য পুরুষকে কামনা করছে না। অতএব শেষ রাত হলে আমি একা থাকতে চাই। ঈশ্বরের অনুমতি নিয়ে যদি আপনাকে নির্বাচন করি তাহলে ভোরবেলায় হয়তো শুনব ওই ভদ্রলোকের নানারকম গুণের প্রশংসা করছেন। কী দরকার।'

'ভোরবেলা? সেটা তো রাত ফুরিয়ে যাওয়ার সময়।' ভদ্রলোক বললেন। 'ভরপেট আরাম করে খাওয়ার পর যদি শোনেন খাবারে নোংরা ছিল তাহলে কি কারো বমি হয়ে যায় না?' আমি হাসলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'চমৎকার বলেছেন। এসব আলোচনা আমরা করছিলাম কেন না আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে আগ্রা শহরে গিয়ে তাজমহল দেখার। এবারে সেটা পূর্ণ করব ঠিক করতেই লিজা চটে লাল হয়ে গেছে। সে কিছুতেই আমাকে তাজমহল দেখতে যেতে দেবে না।'

লিজা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি ভদ্রলোকের কাছে কারণ জানতে চাইলাম।

'লিজার ধারণা ইণ্ডিয়াতে প্রচুর সুন্দরী মহিলারা ঘুরে বেড়ান। তাঁরা ম্যাজিক জানেন। আমার মতো সুপুরুষ সেখানে গেলে তাঁরা ম্যাজিক প্রয়োগ করবেনই এবং আমি আর ফিরব না।'

'এরকম উদ্ভট ধারণা হলো কেন?'

'একটা বই পড়ে। তাছাড়া ওর এক আত্মীয় ইণ্ডিয়ায় গিয়ে ইণ্ডিয়ান বিয়ে করেছে।'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?'

'কি করে যাবে? ওর স্বামী সেটা মেনে নেবে না।'

হোঁচট খেলাম। সম্পর্কের এতটা অগ্রগতি যদি স্বামী দেবতাটি মেনে নিতে পারেন তাহলে দেশের বাইরে যেতে আর আপত্তি কেন?

বললাম, 'লিজা আপনি ভুল ভেবেছেন। ভারতবর্ষের মেয়েরা সত্যি সুন্দরী। তবে তাদের সৌন্দর্য ভেতর থেকে তৈরি হয়ে বাইরে আসে। তাই যে সেটা দেখতে পায় সেই একমাত্র খুশি হয়। কিন্তু এদেশের মেয়েরা কাউকে প্রলুব্ধ করে না সচরাচর, কারণ তাদের মধ্যে সংস্কার তীব্রভাবে কাজ করে। তারা নিজেরা কখনই সক্রিয় হয় না। অতএব ইনি যদি উদ্যোগী না হন তাহলে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। হাজার হোক তাজমহলকে তো আপনারা লণ্ডনে আনতে পারেন নি।' শেষের খোঁচাটা লিজা ধরতে পারল না। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'উদ্যোগ আবার নেবে না। পুরুষজাতটার স্বভাবই তো তাই। আগ্নেয়গিরির মুখে ধোঁয়া না দেখলে কেউ সেটাকে মৃত ভেবে ঘর তুলতে পারে, কিন্তু আমি পারব না।'

মণিমাসীর কথা মনে পড়ল। লিজা এখন অবিকল মণিমাসী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে থাকার জায়গার অভাবে আমি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরের কাছে আড়িয়াদহে দুটি ছেলের সঙ্গে থাকতাম। তাদের বাড়ি ওটা। মা বাবা আত্মীয়েরা থাকত ধানবাদে। আমরা তিনজন একটা চাকরের ভরসায় দিব্যি আরামে ছিলাম। সেই সকালে স্নান খাওয়া সেরে বেরিয়ে আসতাম আর ফিরতাম শেষ ট্রেনে। মাঝে মাঝে দমদম পার হবার আগেই ঘুম আসতো শরীরে। যখন কানের ভেতর দুম দুম শব্দ ঢুকত তখন চমকে চোখ মেলে দেখতাম ট্রেন রাতের বালিব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা স্টেশনটি ছেড়ে এসেছি। দুদ্দার করে পরের স্টেশনে নেমে সেইসব সুনসান রাতে একা গঙ্গার ওপর বালিব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতাম। প্রচণ্ড ভয় পেতাম সে সময়। পুরো ব্রিজটা ফাঁকা, তুমুল হাওয়া দিত, আলোগুলো একচোখো ডাইনির মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকত। এমন কি অনেক নিচের গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দ পেয়ে যেতাম। অথচ আমার পকেটে তখন দু'এক টাকার বেশি সম্পত্তি থাকত না, তবু ভয় হত। কিসের ভয়

তা তখনকার আমিই জানতাম। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের কাছে এসে স্বস্তি পেতাম। দু-একটা আলো জ্বলছে। যারা ট্রেন থেকে ঠিকঠাক নেমেছিল তারা চলে গেছে। কিন্তু অবিনাশমেশোকে দেখতে পেতাম। দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কাছে যেতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন, 'সমরেশ না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলে? আমি তো প্রায় এক যুগ ধরে এখানে অপেক্ষা করছি।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আজও। ব্রিজ পেরিয়ে নেমেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে হাতের ভর রাখতেন ভদ্রলোক, 'উঃ তোমার ভাগ্যটা আমার কেন হলো না? ওই স্টেশনটা যদি কোনোমতে ঘুমিয়ে পার করে দিতে পারতাম!'

'কোন্ স্টেশন?'

'শোনহে।' হাঁটা শুরু করতেন অবিনাশমেশো, 'ছেলেদের জীবনে এক একটি মেয়ে হলো এক একটি স্টেশন। প্রথম স্টেশন হলো জননী যেখান থেকে ট্রেনটা ছাড়ছে। ধর শ্যালদা। উল্টোডিঙি দমদম হলো পিসিমা মাসীমাদের মতো মহিলারা। তারপর এক একটি স্টেশন এক একজন মেয়ে। এই করতে করতে একটা জংসন স্টেশন এসে যায় যাব পর তোমার ট্রেনটা থ্রু-ট্রেন হয়ে যাবে। পথে স্টেশন পড়লেও থামা চলবে না। তখন তোমার আর ডেস্টিনেশন বলে কিছু নেই, শুধু ছুটে যাও। আমার এই জাংসন স্টেশন হলো তোমার মণিমাসী। যদি কোনো ভাবে ঘুমিয়ে তোমার মতন, মণিমাসীর স্টেশনটা পার করে দিতে পারতাম হে, তাহলে আর যাই হোক এভাবে উল্টোমুখে হেঁটে আসতাম না।'

অবিনাশমেশোর মুখ থেকে চমৎকার মদের গন্ধ বের হতো। সেটা আমাদের এমন একটা বয়স যখন মদ্যপকে ক্ষমা করতে শিখিনি। অথচ

অবিনাশমেশোকে মোটেই মদ্যপ মনে হতো না। উনি থাকতেন আমার আশ্রয়ের ঠিক পাশেই। মণিমাসীর বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। বাড়ির ছেলেদুটো ওঁকে মাসী বলতো তাই আমিও দলে ভিড়েছিলাম। দূরে থেকে দেখতে পেতাম ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়ির সামনে আসতেই সেটা নিভে যেত। অবিনাশমেশো দরজায় ধাক্কা মারতেই গালাগাল শুরু হয়ে যেত। সেটা চলত আমার শুয়ে না পড়া পর্যন্ত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম ওরকম স্টেশন যেন আমার কপালে না জোটে। সকালে মণিমাসী কিন্তু অন্য মানুষ, হাসিখুশি, আমাদের রান্নাবান্নার খোঁজ-খবর নেন। আমায় বলেন,'অত রাতে বাড়ি ফের কেন? ব্যাটাছেলেদের রাত করে বাড়ি ফেরার অভ্যাস খুব খারাপ।' মেজাজ ভালো বুঝলে জিজ্ঞাসা করেছি,'আপনি রাত্রে অবিনাশমেশোকে অত বকেন কেন?' পেত্নী বাড়ি। পুরুষমানুষ সন্ধ্যের পর বাইরে কাটাচ্ছে আর মেয়েছেলের গন্ধ গায়ে মাখছে না এ আমি এক গলা জলে ডুবে বললেও বিশ্বাস করব না। ওরা হলো আগুনের মতো, তৃপ্তি নেই কিছুতেই। ওই বকাঝকা করি বলে তবু বাড়ি ফেরে, নইলে রাত কাবার করত।'

লিজার সঙ্গে মণিমাসীর তফাৎ কতটুকু? সত্য কখনও মানুষ বিশেষে ভিন্ন হতে পারে না। সত্য দেখার চোখের তারতম্যে চেহারা পাল্টাতে পারে মাত্র। রূঢ় কথা হলো, একটি পুরুষ শিক্ষা এবং পরিবেশের চাপে বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে নিজেকে যে পরিমাণ সংশোধন করতে পারে একটি মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা কোনো রমণীর সঙ্গে ইংলিশ মিডিয়াম অথবা ভালো স্কুলে পড়া, প্রগতির তালে পা মেলানো মহিলার রুচি, চিন্তাধারার আসমান জমিন ফারাক হবেই। কিন্তু যখন নিজস্ব পুরুষটিকে নিয়ে হৃদয়ের টানাপোড়েন শুরু হয় তখন হরিপদ কেরানি আর আকবর বাদশা একাকার হয়ে যান। ঈর্ষার থাবা দু'জনকেই একইভাবে আত্মস্থ করে।

আমি পালের কাছে উঠেছি এবং কদিন থাকব শুনে ওঁরা জানালেন আরও দু-একদিন দেখা হবে। বিল মিটিয়ে দেবার সময় দেখলাম পাঁচ পাউণ্ডের নোট ফেরত নিলেন না। ওঁরা চলে যাওয়ার পর কাউ-ণ্টারে ফিরে এলাম। এখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। অথচ খদ্দের আসার বিরাম নেই। পালের মুখে খুশি খুশি ভাব। লক্ষ্য করলাম ওয়েটাররা বকসিস যা পাচ্ছে তা একটা বাক্সের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। কলকাতায় শুনেছি কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই বকসিস ওয়েটাররা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। এখন স্পিকারে রবিশংকর বাজছে। পাল ইতিমধ্যেই তিনরকম স্কচ খাইয়েছে আমাকে। জলের কোনো বালাই নেই, সবাই অন রক্। অথচ শরীরে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তিনটে নাগাদ ভিড় কমতে লাগল। কয়েকটি টেবিল খালি। পাল বলল, 'ঠিক চারটেয় বন্ধ করব আজ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত রাত্রে ডিনার খাচ্ছে কেন এরা।'

পাল জবাব দিলো,'এদের সকাল হবে দুপুর বারোটায়। হিসেব ঠিক আছে। কাল ভোরবেলায় রাস্তায় বেরুলে একটা লোককেও দেখতে পাবেন না। সপ্তাহের দুটোদিন এরা এইভাবে জীবন উপভোগ করে।'

বিগ জনকে দরজা খুলতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে জনা ছয়েক ছেলেমেয়ে ঢুকল। তিনটেই কালো ছেলে সাদা সঙ্গিনী নিয়ে এসেছে। ওরা চিৎকার করতে করতে নিজেরাই টেবিল জোড়া দিয়ে বসল। পাল বলল, 'শেষ রাত্রে আবার ঝামেলা। একটি কালো ছেলে চেয়ারে বসেই পালের সঙ্গিনীকে টেনে নিয়ে এল কোলের ওপর। অন্যেরা চিৎকার করে হাততালি দিলো। বিগ জনকে দেখলাম পালের কাছে চলে আসতে। এখনও রেস্টুরেণ্টে খদ্দের আছে। এই আব-হাওয়া তৈরিতে তারা বিরক্ত হতেই পারে। সানি গিয়ে দাঁড়াল ওদের টেবিলে খাবারের অর্ডার নিতে। তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর এক শ্বেতাঙ্গিনী নিগ্রো ছেলেটির, যাকে নেতা মনে হচ্ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ

করল। সে চিৎকার করে বলল, 'নাথিং। উই ওয়াণ্ট নাথিং। হা হা হা।'
পাল নিচু গলায় জানাল, 'এই ছোকরারা জামাইকার। স্কলারশিপ নিয়ে এখানে পড়তে এসেছে। ভালো নাচে বলে সাদা মেয়েরা এদের জন্যে পাগল। পড়াশোনা চুলোয় গিয়েছে শুধু এই করছে। এভাবে চললে পঞ্চাশ বছর পর ইংল্যাণ্ড কালো মানুষে ভর্তি হয়ে যাবে।'
ভেতরে উত্তাপ থাকলেও এখন বাইরের শীত আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু মেয়েগুলোর পোশাক দেখে সেসব কিছুই মনে হবে না। নেতা তার সঙ্গিনীকে টেনে টেবিলের ওপর মুখোমুখি বসিয়ে দিতেই পাল কাউণ্টার ছেড়ে বের হলো, 'এই যে ভদ্রলোকের বাচচারা, এবার দয়া করে বিদায় হও।'
একটি মেয়ে তীব্র গলায় বলল,'কে ভদ্রলোকের বাচ্চা, মোটেই নই।'
'তাহলে তো আরওভালো। আমার রেস্টুরেণ্ট সম্পর্কে তোমাদের নতুন করে কিছু বলতে হবে নাকি? উঠে পড়।'
'হে মিস্টার।' নেতা উঠে দাঁড়াল, 'তুমি আমাদের অপমান করছ।'
'তাই নাকি? জন, এদের দেখাশোনা করো।' কথাগুলো বলে পাল চলে এল কাউণ্টারে। বিগ জন শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল। আমি একটা চমৎকার ফাইটিং সিন দেখব বলে টানটান হয়ে আছি। বিগ জন এগিয়ে যেতে একটি সাদা ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সেটা ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে, 'ওহো ডিয়ার! হাউ অ্যাবাউট এ ড্রিংক!'
জন কোনো কথা না বলে খপ করে নেতাটির জামার কলার ধরল এবং কিছু বোঝার আগেই একটা আলতো শব্দ করে ওর বাঁ হাত নিচে নেমে এলো। দেখলাম নেতার মাথা ঝুলে পড়েছে। বাকি দুটো নিগ্রো ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'ইউ মাস্ট নট, ইউ মাস্ট নট!' ওরা চিৎকার করে উঠল। মেয়ে তিনটে কিন্তু বসে আছে চুপচাপ, যেন নাটক দেখছে। বিগ জন ছেলেদুটিকে বলল, 'কোথায় যেতে চাও?

পুলিশ স্টেশন না ডোরমেনস ক্লাবে ?'

একটা ছেলে দুটো হাত ওপরে তুলে নাচল, 'ওকে ওকে ! আমরা খাবারের অর্ডার দিচ্ছি। ওয়েটার, কাম হিয়ার । বলেই ওরা শান্ত ছেলের মতো বসে পড়ল।

বিগ জন বলল,'এইভাবে বসে যদি খেতে পার তাহলে খাবার না দিয়ে রাগ দেখিয়ে তোমাদের বের করে দেবার মতো মূর্খ আমি নই। অনেক ঝামেলা করেছ এবার শেষ বাজারে খেয়ে দেয়ে কিছু পয়সা ছাড়।' কথাগুলো শেষ করে বিগ জন কিন্তু চলে এলো না। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

তারপর একটি চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। দুটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে গেল চিকেন তনদুরি আর নানরুটি । ওদের নেতা কালো ছেলেটি সেই যে চেয়ারে মাথা হেলিয়েছিল, একবারও ওঠাল না। দেখে মনে হলো ওঠাবার সামর্থ্য ছিল না । বিগ জনের শিক্ষিত আঘাতে বেচারার চেতনাই ফিরে আসছিল না। খাওয়া শেষ হলে সানি প্লেটে বিল নিয়ে ওদের সামনে রাখল। তারপর কফি-হাউসি দৃশ্যটি দেখলাম। কলেজ জীবনে কফিহাউসে গিয়ে কফি পকৌড়া খাওয়ার পর বিল মেটানোর সময় আমরা সবাই পকেট থেকে ঝেড়েঝুড়ে পয়সা বের করতাম আর রামু বেয়ারা দাঁড়িয়ে হাসত। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেখা গেল পাঁচ পাউন্ড কম পড়েছে । নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলা, ঝগড়া ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার পর একটি লম্বা মেয়ে উঠে এলো কাউন্টারের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম, 'আই অ্যাম সরি। উই আর রানিং শর্ট অফ ফান্ড !'

'আই কাণ্ট ডু এনিথিং।' গম্ভীর গলায় বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম স্কচ আমার গলার স্বর বেশ পাল্টে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

'অফকোর্স ইউ ক্যান ডু। আমি যদি কাল এসে ওটা দিয়ে যাই তাহলে কিছু মনে করবে না নিশ্চয়ই। আমার ওপর বিশ্বাস করতে

পার। আমি মার্গারেট থ্যাচারের চেয়ে কম বিশ্বাসযোগ্য মহিলা নই।' মেয়েটি ঠোঁটে হাসি চটকাল।'

'আই অ্যাম সরি।'

'ওঃ নটি ! ডোণ্ট সে সো। কাম অন, হাউ এ্যাবাউট এ কিস ?'

'কিস্ ! তোমাকে ? কেন ? আমার কান ঠিক শুনছে কিনা বুঝতে পারছিলাম না।

'ক্ষতিপূরণ। বন্ধুরা বলে আমার একটা কিসের দাম দশ পাউণ্ডের কম নয়। আমি তোমাকে সস্তায় দিচ্ছি। ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট।' মেয়েটি বড় বড় নখে টেবিল বাজাল। তাকিয়ে দেখলাম পাল খুব মজা পেয়েছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। টেবিলে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো একটা ফয়সালার জন্যে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। এমন কি বিগ জনের ঠোঁটেও হাসি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'মাই মাম্ টোল্ড মি নট টু কিস এ স্ট্রেঞ্জার।'

'ওহ্ ! আই অ্যাম নট স্ট্রেঞ্জার এনি মোর !'

সেই সময় দরজা খুলে গেল। ইউনিফর্ম পরা বিশাল চেহারার এক সাহেব পুলিশ ভেতরে ঢুকে টুপি খুলল, 'হাই পল ! হাউ ইজ ইওর বিজনেস ? এ পিসফুল নাইট ? সানি ! ভদকা উইদ টনিক। হাই জন, কাম অন বয় ?' লোকটা দরজার সামনে সোফায় গিয়ে বসল। এদিকে পুলিশটিকে দেখেই কাউণ্টার থেকে মেয়েটি চলে গেছে তাদের টেবিলে ঝটপট। তারপর ঘুমন্ত অথবা জ্ঞানহীন লোকটির পকেট থেকে পার্স বের করে ওরা দাম মিটিয়ে দিলো। লক্ষ্য করলাম নিজেদের পকেট থেকে বের করা পয়সা ওরা আবার চটপট ফিরিয়ে নিল। দাম মিটিয়ে পার্সটা নেতার পকেটে ঢুকিয়ে দু'জন দু'দিক থেকে তাকে টেনে তুলল। নেংচে নেংচে ওরা যখন দরজার দিকে যাচ্ছে তখন পুলিশটি বলে উঠল, 'এ্যাই খোকাখুকীরা, এত মদ খাও কেন যখন নিজের পায়ে হেঁটে যেতে পার না ?' ওরা জবাব দিলো না।

খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেতার অচৈতন্য শরীর কিভাবে নামিয়ে নিয়ে গেল তা দেখার জন্যে মুখ বাড়াইনি। কিন্তু কী ধরনের আঘাত যা দীর্ঘ-সময় একটি মানুষকে জ্ঞানহীন করে রাখে? লোকটা যে মরে যায়নি তা বুঝেছি ওকে যখন চেয়ার থেকে টেনে তোলা হলো। বিগ জনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে হেসে বলল, 'অনেক পরিশ্রম করে এসব শিখতে হয় হে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা আগামীকাল বদলা নিতে পারে না?' বিগ জন মাথা নাড়ল, 'না। ওদের সেই মেরুদণ্ড নেই।'

ভোর সাড়ে চারটের সময় আমরা বাড়ি ফিরলাম। পালের রেস্টুরেণ্টে কয়েকজন কর্মচারি থাকে। কয়েকজনকে সে বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছে কাছাকাছি। এরা সবাই সিলেটের। একজন অবশ্য মেমসাহেব বিয়ে করে আলাদা থাকে। তার নিজস্ব গাড়ি আছে। সানিও নিজের গাড়ি চালিয়ে ফিরে গেল। সাড়ে চারটে অথচ মনে হচ্ছে মধ্যরাত। রাস্তায় দু-একজন ঘরমুখো লোক। ঠাণ্ডা যেন রক্তে করাত চালাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে যে দু'জন কর্মচারি আছেন তাঁদের একজন বৃদ্ধ অন্যজন যার স্ত্রী মেমসাহেব।

দরজা খুলে ভেতরে পা দেওয়ামাত্র মচমচ করে উঠল সিঁড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। রাত্রের সেই চোরের অথবা ভূতের শব্দটা মনে পড়ল। পাল বলল, 'এবাড়ির কোনো দরজা খুললে সিঁড়িতে শব্দ হয়, ওপরে হাঁটলে নিচে প্রতিধ্বনি হয়।' সেটা লক্ষ্য করলাম। ঘরের একটা দরজা খুলতেই উল্টোদিকের লক্ না করা দরজাটা আপনা থেকেই ভৌতিক ছবির মতো খুলে গেল।

যে ছেলেটির মেমসাহেব বউ সে পাউণ্ডের থলিটা টেবিলে রাখতেই, বৃদ্ধ ভদ্রলোক গুনতে বসলেন। নোটগুলোর সাইজ অনুযায়ী আলাদা করছিলেন প্রথমে। এতরকমের পাউণ্ড পেনি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। ওদিকে ততক্ষণে ছেলেটি রান্না ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেছে, 'দাদা আবার ভাত খাইবেন নাকি?' পাল সোফায় শরীর

ছেড়ে দিয়ে বলল, 'নাঃ। কফি বানাও।'
আমাদের গরম কফি দিয়ে ছেলেটি ভাত নিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ভোরবেলায় ভাত খাচ্ছেন? রেস্টুরেণ্টে খাননি?'
'না দাদা। রেস্টুরেণ্টের খাবার খাইয়া পেটের সর্বনাশ হইয়া গেছিল। রিচতো। বাড়িতে তো ভাত জোটে না। মেমসাহেব ভাত মাছের ঝুল, ধনেপাতার মর্ম বুঝেন না। তাই দাদার বাড়িতে আইস্যা খাইয়া যাই মাঝেমাঝে।'
মনে পড়ল না পাঁচটার পর ভোরের মুখে আমি কাউকে অমন তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খেতে দেখেছি কিনা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেশে কেউ আছে?'
'সব্বাই। আমরা কিন্তু দাদা এখন ক্যালকাটার লোক। সেভেণ্টি ওয়ানে এক মুসলমানের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ কইর‍্যা জমি নিছিলেন আমার বাবায়। পার্ক সার্কাসে।'
'যান না?'
'নাঃ। তারা ভাবে আমি বিলাইতি সাহেব, যখনই যামু তাদের হাজার হাজার টাকা দিমু। মেমসাহেব বিয়া করছি বইল্যা মায়েরও মন আমারে নেয় না। কেমন যেন ছাড় ছাড় সব।'
'মেমসাহেবের সঙ্গে প্রেম হলো কি করে?'
'ঠিক প্রেম না দাদা। আমার ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে। ভাড়ায় থাকতাম। তার ইণ্ডিয়ান ছেলে পছন্দ। এখানে তো পাকিস্থানী বাংলাদেশী ইণ্ডিয়ানকে কেউ আলাদা দ্যাখে না। রাত্তিরে ঘরে আসতো। একদিন বলে কনসিভ করছে। তার মায়ে কইল বিয়ে কইর‍্যা ছেলের মতো থাক। তাই আছি।'
কোনো সমস্যা নেই। এমন সরল গলায় জীবনের এতবড় ঘটনা কাউকে বলতে শুনিনি। পাল আমাদের কথা শুনছিল। এবার বলল, 'ভাববেন না ওকে চাপ দিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। মেয়েটি চায় নি বিয়ে করতে। মেয়েটির মা মেয়ের ওপর ভরসা রাখতে পারেনি। একটু জমি-

জমা আছে তাই বাঁচাবার জন্যে ওকে পছন্দ হওয়ায় জামাই করে নিয়েছে। ওর মতো ভাগ্য তো সবার হয় না।'

ছেলেটি খাওয়া শেষ করে ডিস দেখাল, 'ভাগ্যের নমুনা তো দেখতেছেন। নিজের ঘরে ভাত হয় না। টাকা গুনা শেষ হলো করিমচাচা?'

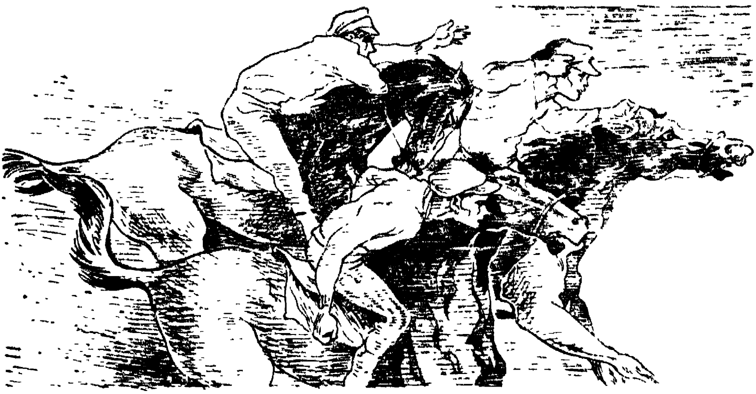
করিমচাচা মানে সেই বৃদ্ধ লোকটি এখন কাগজে যোগ করছেন। মুখে উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর যোগ শেষ করে বললেন,'ভাই সাহেব, আপনি লাকি আছেন। আমি? লাকি? করিমচাচা বললেন, 'এই ইয়ারের হায়েস্ট সেল হইল আইজকা। ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড থার্টি থ্রি পাউন্ডস এ্যান্ড ফরটি পেনি।' টাকা পয়সা গুছিয়ে ব্যাগে ভরে ওরা চলে গেল। অর্থাৎ আজ পালের বিক্রি হলো যা তাতে লভ্যাংশ আধা আধি। মন্দ রোজগার নয়। ভারতীয় টাকায়, এভাবে চললে মাসে প্রায় তিনলক্ষ। খুব ভালো লাগল।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে পাল বলল, 'ঘুমোবেন তো?'

উচিত, কিন্তু ঘুম আসছিল না। যেটুকু ক্লান্তি ছিল তা কফিতেই শেষ হয়ে গেল। তবু উঠলাম। জামাকাপড় ছেড়ে ওপরের ঘরে লেপের তলায় ঢুকে মনে হলো, আঃ কী আরাম। এপাশ ওপাশ করলাম। হঠাৎ মনে হলো, এই যে জীবন আমি যাপন করছি তাতে কোনোদিন অভ্যস্ত ছিলাম না। চিরকাল রাত এগারটার মধ্যে বাড়ি ফিরেছি। আমেরিকায় মনোজের সঙ্গে রাত দেখতে বের হতাম। সেই প্রথম। কিন্তু এই আমি কোপেনহেগেন থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে এতটা পথ ডিঙিয়ে এখানে এসে চমৎকার রাত জাগছি, স্কচ খাচ্ছি এবং কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কে বলে মানুষের শরীর একটাই জীবন পার করে। এক শরীরে দু'দুটো জীবন তৈরি করার সামর্থ্য তো মানুষেরই থাকে। পঞ্চাশ পেরিয়ে যে সমস্ত বাঙালি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করতেন তাঁদের পক্ষেও তো এক শরীরে দুটো জীবন যাপন সম্ভব হয়েছে। এইসময় নিচে মচমচ শব্দ হলো। আর আমি তড়াক করে

লেপ সরিয়ে নিচে নেমে কার্পেট তুললাম। বাঃ, আমার সম্পত্তি যেমন রেখেছিলাম তেমন ঠিকঠাক আছে। আবার বিছানায় ওঠার সময় হাসি পেলো। দুটো কেন, অনেকগুলো জীবন মানুষ যাপন করতে পারে যতক্ষণ ওইটে ঠিকঠাক থাকে।





৫

নতুন জায়গায় ঘুম ভাঙা মাত্র সকালটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। ঘুমের সঙ্গে আমার ভারি চমৎকার মিত্রতা আছে, এখন পর্যন্ত। সুইচ টিপে আলোনেভানোর মতোই ঘুম আমাকে দখল করে বিছানায় শরীর মেললেই। লম্বা রাতটাকে সুপার এক্সপ্রেসের মতো এক ছুটে পার করে দিয়েও সে ছেড়ে যেতে চায় না. আলস্য হয়েজড়িয়ে থাকে যতটা পারা যায়। বাল্যকালে পিতামহ বিছানা থেকে তুলে শেষরাতে তিস্তার ধারে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে সেই যে বেড়াতে নিয়ে যেতেন তার প্রতিবাদেই সম্ভবত চুপচাপ বিছানায় থাকতে ভারি ভালো লাগে। কে বলে বাল্যকালে যাতে অভ্যস্ত হওয়া যায় জীবনভর তার ব্যতিক্রম হয় না। অন্তত আমি তো সেরকম করলাম না, নিজেকে ভেঙে আবার জুড়ে নিতে বড় আরাম। বোস্টনের সকালটা কেমন দেখবার জন্য একটানে লেপ সরিয়ে উঠে বসতে গিয়েই খেয়াল হলো এখন মোটেই সকাল হতে পারে না। শরীরে ক্লান্তি নেই যখন তখন লম্বা ঘুম হয়েছে। আমি যখন বিছানায় ঢুকেছি তখনই কলকাতার

মানুষে লেকে বেড়াতে যায়। অতএব এখন তো দুপুর হবার কথা। অথচ ঘরে এক ফোঁটা আলো ঢুকছে না। রুম হিটারটাও বন্ধ দেখছি। একটা সোয়েটার পরা ওম্ রয়েছে ঘরে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাথা ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলাম, ঠিক বারোটা।

ছেলেবেলায় পিতামহের বৃদ্ধ দেওয়াল ঘড়ি যখন দুটো হাত একত্রিত করে বারোটার ঘণ্টা তুলত তখন আমি কানে আঙুল দিতাম। বারোটা বাজার শব্দ শুনতে নেই, এরকম ধারণা ছিল। যাহোক, সকালটাকে যখন দেখা যাবে না তখন আর এক প্রস্থ ঘুমালে মন্দ হয় না। কিন্তু আলো আসছে না কেন। জানলায় অবশ্য ভারি পর্দা রয়েছে, কয়েক পা এগিয়ে সেটাকে সরিয়ে উঁকি মারতে দেখি সারারাতের হিম কাঁচের ওপর পড়ে দৃষ্টি অগম্য করে তুলেছে। পাজামার ওপর শাল জড়িয়ে দরজা খুলে প্যাসেজে চলে এলাম। পালের ঘরে পাল নেই। মনে পড়ে না কলকাতায় কখনও বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি কিনা। এখন পাল যদি বিছানায় থাকত তাহলে স্বস্তি পেতাম। গরম জলে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় শব্দটা বাজল। আশ্চর্য গেঁড়াকল। চোরের মতো বাড়ি ফেরার তো উপায় নেই পালের। পাল-গিন্নী এখন নেই তাই রক্ষে। নিচের দুটো ঘরেও পালের দেখা পেলাম না। ডাইনিং কাম টিভি রুমে পেঁছে ওর নোট পেলাম। চা তৈরি করে গরম রাখার ব্যবস্থা করে গিয়েছে। খুব খিদে পেলে একটা বড় কেক যেন বের করে নিই। পাল গিয়েছে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে। ফিরে এসে লাঞ্চ করবে এবং আমি যদি ঘুম থেকে উঠে এই নোট দেখি তাহলে যেন সেইভাবেই তৈরি হয়ে নিই।

টিভি খুলে দিয়ে চা কেক নিয়ে বসলাম। আঃ। এর চেয়ে আরাম আমি খুব কম পেয়েছি। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কেউ টেলিফোন করছে না, সমরেশবাবু আছেন বলে কেউ মুখ দেখছে না, এমন কি যে জিনিসটাকে মাঝে মাঝে কাঁধ থেকে নামাতে পারি না ইচ্ছে হলেও,

এই লেখালেখি, সেটিকেও বর্জন করে চুপচাপ বসে আছি। এইরকম আলস্যের ফুলদানিতে ফুল হয়ে বসে থাকার যে কি সুখ—! আহা! টিভি'র দিকে নজর দিলাম। বিলিতি টিভি'র বিজ্ঞাপনে সুন্দরী যুবতীরা এত কম কেন? এই সময় বিবিসির খবর আরম্ভ হলো। একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা হাতে একটা ফাইল নিয়ে নিউজরুমে ঢুকলেন। একে হেলো ওকে ভালো বলে নিজের ডেস্কে পেঁৗছে সেখানে পশ্চাতদেশ ঈষৎ ঠেকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'নমস্কার। আজ দুপুরের বিশেষ বিশেষ খবরগুলো আপনাদের প্রথমে শুনিয়ে দিই।'

ভালো লাগল বলার ধরনটা। কোনো সাজানো খবর পড়া নয়, পরিবেশ এবং বলার ভঙ্গীতে মনে হলো আমি যেন ঢুকে গেছি ওই নিউজ রুমে। তারপরেই মনে হলো আমি খবর শুনছি কেন? পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তা জানার কোনো দরকার এই মুহূর্তে আমার নেই। চেনা পৃথিবীর বাইরে চলে এসে অচেনা পৃথিবীর খবর নিয়ে কি লাভ হবে? যন্ত্রটাকে বন্ধ করে দেবার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়ে থেমে গেলাম। যুবতী বললেন, 'এখন হিপিরা। হ্যাঁ, ওরা বৃটিশ সরকারকে আরও বিপাকে ফেলেছে। চলুন আপনাদের হাইওয়েতে নিয়ে যাই। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি—।' এই পর্যন্ত বলার পর পর্দায় একটি ভদ্রমুখ ভেসে উঠল, 'হাইওয়ে থেকে বলছি। সকালের খবরে জেনেছেন হিপিদের কনভয় পুলিশের নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। গতরাতটা ওরা মোটামুটি শান্তভাবেই হাইওয়ের পাশের এক গোচারণভূমিতে কাটিয়েছিল। সরকার থেকে ওদের জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এইসব যখন ভদ্রলোক বলছিলেন তখন আমরা বিরাট কনভয়টাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আকাশ মেঘে কালো হয়ে আছে। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেও কিছু হিপি খোলা জিপে বসে বাজনা বাজাচ্ছে। এবার ক্যামেরাম্যান চলে এল

হিপিদের নেতার সামনে। এঁকে গতকাল আমি টিভিতেই দেখেছি। নেতা চিৎকার করে উঠল, 'খাবার দিচ্ছে ? একে খাবার বলে ? আফ্রিকার ভয়ঙ্কর খরার শিকার মানুষরা এরকম খাবার পেলে গিলতে বাধ্য হবেন। বৃটিশ সরকার আমাদের সেইরকম ভাবল, এটাই আপসোস। আরে আমাদের দেখে সমাজবিরোধী নরকের কীট বলে মনে হচ্ছে কি ?'

প্রশ্ন হলো, 'আপনাদের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কি ?'

'এইরকম বোকা বোকা প্রশ্ন রাজনীতির দালালগুলোর জন্যে তুলে রেখহে। জীবনযাত্রা। আমরা কোনো যাত্রা ফাত্রা করতে চাই না। আমরা টেনসন ফ্রি জীবন চাই। খাও পিও আর মজা কর। সাজানো সভ্যতার পাছায় এক জোড়া লাথি মারো। ব্যস, আর কিছু না।' নেতা মুখ ঢুকিয়ে নিলেন কনভয়ে।

প্রতিনিধি বললেন, 'একটু আগে পুলিশ একটি সমস্যায় পড়েছিল। গত রাত্রে হিপিরা যে গ্রামের পাশে রাত কাটিয়েছিল সেই গ্রামের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেছিলেন, হিপিরা ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ইলোপ করেছে। তাঁর বিশ্বাস মহিলাটিকে হিপিদের কনভয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ কনভয়টিকে সার্চ করে। মহিলাকে পাওয়া যায় চার নম্বর ক্যারাভ্যানে। তিনি তখন একজন হিপিনীকে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরায় আমরা একজন প্রৌঢ়াকে দেখতে পেলাম। তাঁর পাশে কাঁচি হাতে এক শীর্ণা হিপিনী বসে। চুল কাটা সম্পূর্ণ হয় নি।

'মিসেস স্মিথ, আপনার স্বামী অভিযোগ করেছেন যে হিপিরা আপনাকে জোর করে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। এর প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হবে। মন্তব্য করুন।'

'পাগল। আমি কি কচি খুকী যে কেউ জোর করে ধরে আনবে ? আমার বয়স বাহান্ন।'

'কত বছর আপনার বিয়ে হয়েছে ?'

'তিরিশ।'

'ছেলেমেয়ে ?'

'চারজন। সবাই যে যার মতো জীবন বেছে নিয়েছে।'

'আপনি, মানে আপনার মতো একজন ভদ্রমহিলা, হঠাৎ না বলে এই দলে এলেন কেন ? আমি ধরে নিচ্ছি কেউ আপনাকে বাধ্য করে নি আসতে।'

'বলে আসতে চাইলে আর আসা হতো না।'

'কিন্তু আপনি একজনের স্ত্রী, তার অনুমতি ছাড়া—।'

'আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আমি একজন ক্রীতদাসী, মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি এমন অপরাধ আমার। এটা কি মধ্য যুগ আমার স্বাধীনতা আছে নিজের মতো করে চলার। তার যদি আপত্তি থাকে ডিভোর্স নিক।'

'কিন্তু তিরিশ বছরের সংসার ভেঙে আপনি হিপিদের জীবন বেছে নিলেন কেন ?'

'ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। বিয়ের পর থেকে ওই সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গিয়েছিল। (বাক্যটাকে অন্য ভাষায় বলেছিলেন)। শুধু চারবার গর্ভধারণ করা ছাড়া আমি নিজের জন্যে কিছুই পাইনি। একঘেঁয়েমির শিকার হয়ে গিয়েছিলাম। স্বামী হিসেবে ওর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। মানুষ হিসেবে ওর ভাবনাচিন্তা মধ্যযুগীয়। এই সময় শুনলাম হিপিরা আমাদের হাই-ওয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এদের জীবনে আর যাই থাক একঘেঁয়েমি নেই। তাই চলে এলাম। এই দেখুন ও আমার চুল কেটে দিচ্ছে। এত যত্নের চুলগুলো রেখেই বা কি লাভ হয়েছিল ? মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে বাকি জীবনটা উপভোগ করতে পারব।' 'মিসেস স্মিথ, আপনার বয়স হয়েছে। হিপিদের দলে আপনার বয়সী তো কেউ নেই।'

'তাতে কি এসে গেল। হিপি মানে বাঁধনহারা। বড্ড জ্বালাচ্ছেন,এবার ওকে চুলটা কাটতে দিন।' ভদ্রমহিলা কাঁচির সামনে মাথা এগিয়ে দিলেন।

খবর শেষ হলো। আমি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ খুব ইচ্ছে হলো ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু কোথায় কোন্ হাইওয়েতে কনভয়টা আছে তাই তো জানি না। আর এই সময় পাল এল, হাতে কয়েকটা প্যাকেট। নিজেই বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেছে।

'গুড আফটারনুন! ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

'চমৎকার। আপনি কাগজ পড়েন না?'

'ওহো, আনা হয়নি।' পাল কিচেনের দরজা দিয়ে ঢুকে পাশের গলিতে চলে গেল। ফিরে এল কাগজ নিয়ে। জানলাম কাগজওয়ালা ওখানে রেখে দেওয়া একটা বাক্সে কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি প্রথম পাতায় নজর বোলালাম। কোনো খবর নেই। তৃতীয় পাতায় হিপিদের আবিষ্কার করলাম। হিপিদের কনভয় যে পথ দিয়ে যাচ্ছে তার একটা ম্যাপ ছেপে দেওয়া হয়েছে। পালকে সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,'কতক্ষণ লাগবে এখানে পৌঁছতে?' পাল বলল,'মিনিট পঁয়তাল্লিশ, কেন?'

'আমি একবার ওখানে যেতে পারি?'

'হিপিদের দেখতে?' সে হেসে উঠল হা হা করে, 'আপনি হিপি দ্যাখেন নি?' প্রশ্নটা শোনামাত্র মনে হলো এইভাবে ভদ্রমহিলাকে দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। একজন তাঁর চেনা পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে নিজের মতো জীবনযাপন করতে চাইছেন, তাঁকে চিড়িয়াখানার জীব দেখতে যাওয়ার মতো গিয়ে দেখার কোনো যুক্তি নেই। আমার আগ্রহ তাঁর কাছে বিরক্তিকর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দুপুরের খাওয়া প্রায় বিকেলে সেরে পাল বলল, 'চলেন আপনাকে বোল্টনটা দেখিয়ে আনি।' পাল আমাকে একটা ওয়াটারপ্রুফ পরতে

দিলো। দরজা খুলে বাইরে পা দিয়ে চমকে উঠলাম। সূচের চেয়ে ধারালো হাওয়া বইছে। মুহূর্তেই সমস্ত শরীর কনকনিয়ে উঠল। আকাশ থেকে মেঘ নেমে এসে যেন ঘুড়ির মতো ঘুরছে। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে সেই সঙ্গে। বৃটিশ ওয়েদার অথবা লণ্ডনের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার যে গল্প এতকাল শুনেছিলাম তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরে মনে হলো ঘরে ফিরে চাদর মুড়ি দিয়ে টিভির সামনে বসলেই ভালো হতো। পাল বলল, 'গাড়ি নেব না, হাঁটব। হাঁটলে ভালো দেখতে পাবেন।' মরেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলে নিজের অক্ষমতা ধরা পড়বে। পালের কিছু অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হলো না।

এমন মেঘ হাওয়া আর ঠাণ্ডা দুপুর কখনও দেখিনি। এ জীবনে দার্জিলিঙ-এ গিয়েছি অন্তত বাইশবার। সেখানেও নয়। ঝকঝকে ভেজা রাস্তায় যেন আঁধার নেমেছে। দুপাশে কোনো দোকানপাট খোলা নেই। রেস্টুরেণ্টের রাস্তায় বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগলাম আমরা। বিদেশী ছবিতে এমন দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে দু-একটা। মোড়ের মাথায় একটা বই কাম ম্যাগাজিনের দোকান খোলা। দোকানের মালিকান পালকে দেখামাত্র ডাকল, 'হাই পল!'

'হাই।' পল দোকানে ঢুকতে স্বস্তি পেয়ে আমিও অনুসরণ করলাম। 'কি ওয়েদার! ছি ছি। অন্যবার এই সময় সামার এসে যায়। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে তত প্রকৃতি বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি কি বল?' ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের গায়ে। কিন্তু মুখ চোখ এঁকেছেন কিশোরীর মতো। শরীরের বাঁধুনি ঠিক রাখার চেষ্টাও আছে। পাল বলল, 'হতে পারে। আজ রাত্রে মনে হয় রেস্টুরেণ্টটা ফাঁকা যাবে।'

'দ্যাখো, বিকেলের পরে ওয়েদার যদি ভালো হয়।'

পাড়ার প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা হলে যেভাবে মানুষ গল্প করে সেই ধারায় কথাবার্তা চলল। আমি ম্যাগাজিনগুলো ওল্টালাম। সিরিয়াস

কাগজ যেমন আছে তেমনি বিবস্ত্রা তরুণীর ছবি মলাটে ছাপা কাগজের অভাব নেই। একটার মলাটে ক্যাপসন দেখলাম, 'আই নেভার কিসড মাই মাম, শী কিসড মি।' হঠাৎ ভাবতে চাইলাম আমি কখনও আমার মাকে চুমু খেয়েছি কিনা! মনে পড়ল না। বাঙালির শৈশব বার্ধক্যেও কাটে না, সত্যি কথা, শুধু মায়েরা যে কখন নিজেদের গুটিয়ে নেন সেটাই ধরতে পারা যায় না।

হঠাৎ শুনলাম মালিকান বলছেন, 'ইটস ডেঞ্জারস পল। তুমি নিশ্চিত যে ওই হিপিদের দল বোল্টনের পাশ দিয়ে যাবে না?'

পাল বলল, 'হ্যাঁ। ওদের রুট তো আলাদা।'

'পুলিশকে বিশ্বাস নেই। যদি এদিকে ওদের ঘুরিয়ে দেয়? আমার মেয়েকে একটুও বিশ্বাস নেই। ওরা এদিকে এলে ও জয়েন করতে পারে। তিরিশ বছর সংসার করার পর ওই বুড়ি কিভাবে হিপিদের দলে ভিড়তে পারল, বল? তুই কি পাবি? হিপি মানেই তো ফ্রিসেক্স। তোর আর ওই বয়স আছে? কি লজ্জার কথা।' আমি মহিলার দিকে তাকালাম। মোক্ষদা পিসীর মতো গলা এখন। আর তখনই আমার মাথায় গল্পটা চলে এল। 'দেশ' পত্রিকায় গল্প লিখেছিলাম, 'হিপিরা এসেছিল।'

যে কোনো রকমের উটকো ঝামেলা কেউই পছন্দ করে না, বৃটিশরা আবার এক কাঠি ওপরে, ঝামেলার সিঁদুরে মেঘ বহুৎ দূরের আকাশে দেখলেই জানলা দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা আমাদের মতো আছি তুমি তোমার মতো দূরে দূরে থাক বাবা— এই হলো চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া বৃটিশদের ভাবনা। অল্পবয়সীরা নিয়ম ভাঙছে। এখানে বলে রাখি বৃটেনে আমি আফ্রিকা আমেরিকার কালো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে বৃটিশ তরুণীদের ঘনিষ্ঠ হয়ে কত ঘুরতে দেখেছি তার সংখ্যা গণনার অতীত কিন্তু ওইসব দেশের কোনো কালো মেয়েকে নিয়ে সাদা ছেলেকে ঘুরতে দেখিনি। পাল মালিকানের সঙ্গে আমার পরিচয়

করিয়ে দিলো।

মালিকান এক মুহূর্ত আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এখানেই সেটল্ করছ?' 'না। আমি বেড়াতে এসেছি। খামোকা সেটল্ করতে যাব কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মুখে হাসি ফুটল, 'গুড। ভারতবর্ষ শুনেছি বিরাট দেশ, সেখানে অনেক জায়গা। বৃটেনে একেই জায়গা কম তার ওপরে লোকজনের তো আসার বিরাম নেই। আমার এক মাসির বর ভারতবর্ষের চা-বাগানে চাকরি করেছেন পঁচিশ বছর। ওরা ওখানে নাকি রাজারানীর মতো ছিল। ফিফটিতে ওরা দেশে ফিরে এল বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাবে বলে। ওমা, তোমাকে বলব কি, মাসি বলে, কেন এলাম রে এখানে! যে দিকে তাকাই, যে পথে হাঁটাচলা করি শুধু ভারতীয় আর ভারতীয়! এখানে আমরা ওরা সমান। এর চেয়ে ওদের দেশে থেকে গেলে চা-বাগানের রাজত্বটা করা যেত।' মহিলা হাসলেন।

পাল বলল, 'ডোরা, তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

'ওঃ, নো, পাল তুমি আমাদের লোক।'

বাইরে বের হতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু এইরকম মানসিকতার মহিলার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা অস্বস্তিকর। বৃষ্টিটা বেড়েছে, সেই সঙ্গে হাওয়ার দাপটও। পাল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ঠিক আছেন তো?' আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। দুপাশের বাড়িগুলো বেশ পুরোনো হলেও মজবুত। গঠনে প্রাচীন গন্ধ আছে। চওড়া রাস্তা ঝকঝকে। ফুটপাতে লোক নেই। আমরা একটা চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম। জল ওয়াটারপ্রুফ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক এবং সুপার মার্কেট। সবকটার দরজা খোলা কিন্তু লোকজন নেই।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর পাল বাঁ দিকের একটা বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল। চওড়া খোলা দরজার একপাশে উর্দি পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে। সে পালকে চেনামাত্র মাথা নাড়ল, 'হাই পল!'

আমরা ওয়াটারপ্রুফগুলো খুলে পাশের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর একটা কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে পা বাড়ালাম। পাল বলল, 'এটা একটা গ্রামীণ ক্যাসিনো। বহু বছর ধরে চলছিল। তবে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নোটিশ দিয়েছে এটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে। আর বড় জোর মাসখানেকের পরমায়ু।'

'কেন বন্ধ করে দিচ্ছে?'

'এক একসময় এক এক দল ক্ষমতায় আসে। এরা মনে করছে ক্যাসিনো চালাতে দিলে ইয়াং জেনারেশনের ক্ষতি হবে। তারা যা আয় করছে তা ক্যাসিনোতে দিয়ে যাচ্ছে।

আমি মেম্বার এবং আপনি আমার গেস্ট বলে কিছু দিতে হলো না কিন্তু সাধারণ মানুষকে পাঁচ পাউণ্ডের টিকিট কিনে এখানে ঢুকতে হয়।' কথা বলতে বলতে পাল হাত নাড়ল কাউকে উদ্দেশ্য করে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু মনে করবেন না, এখানে কি সবাই সবাইকে চেনে? একটা ছোট শহরেও তো তা সম্ভব নয়।'

পাল বলল, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার একটা রেস্টুরেণ্ট আছে। এই ক্যাসিনোর মালিক আমার নিয়মিত খদ্দের ছিল। আগে যখন মেয়েদের কাজ দিতাম তখন এখানকার অনেক মেয়েই আমার রেস্টুরেণ্টে কাজ করেছে। এই করেই চেনাজানা হয়।'

'গত রাত্রে রেস্টুরেণ্টে কোনো মেয়েকে কাজ করতে দেখলাম না!'

'এখন তো রাখি না। বহুৎ ঝামেলা। ঘরে বাইরে দু-জায়গাতেই.' পাল হাসল।

এই বাদলদিনে ক্যাসিনোর ভেতরেও তীব্র আলো জ্বলছে। যেন ফাল্গুনের কলকাতার দুপুর। ডানদিকে তিনটে কাউণ্টার যেখানে পাউণ্ড ভাঙিয়ে টোকেন নেওয়া যায়। ক্যাসিনোর ভেতরে পাউণ্ড চলবে না, ওই টোকেনে হিসেব হবে। পাল বলল, 'ঘুরে দেখুন তবে বেশি হারবেন না।'

এক পাউণ্ড মানে তখন কুড়ি টাকার ওপরে। হারতে কোন্ নবাবের ইচ্ছে হয়? বন্ধুরা বলেন আমার নাকি জুয়ো ভাগ্য খুব ভালো। যে দশটাকা হারিয়ে দুটো টাকা জেতে তার ওই জিতটাই সকলের নজরে পড়ে, হারটা নয়। পাল চলে গেল সেই পরিচিতের সঙ্গে গল্প করতে, এটা আমিও চাইছিলাম। কাউণ্টার থেকে পাঁচ পাউণ্ড ভাঙিয়ে টোকেন নিলাম। বুড়ি মেমসাহেব আমার দিকে এমন চোখে তাকালেন যেন বলতে চাইলেন, ট্যাঁকের জোর না থাকলে কেন বাবা ডানা গজাল তোমার? প্রথমে যে টেবিলটা পড়ল তার পাশের টুলে বসে একটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে বই পড়ছে। মেয়েটি এই ঠাণ্ডাতেও, অবশ্য ভেতরে ঠাণ্ডা নেই, লাল হাত কাটা গেঞ্জি আর নীল প্যাণ্ট পরে আছে। পরে বুঝেছি এইটেই এখানকার চাকুরে মেয়েদের ইউনিফর্ম। সুন্দর ডিজাইনের বড় টেবিলে বৃত্তাকার কাঠের ওপর এক থেকে কুড়িটি ঘর কেটে নম্বর লেখা। মাঝে মাঝে অবশ্য সরি শব্দটিও লেখা রয়েছে। বৃত্তাকার কাঠটির কেন্দ্রে একটা স্ট্যাণ্ড থেকে সরু ইস্পাতের ফলা সমান্তরালভাবে ইঞ্চি দুয়েক ওপর দিয়ে চলে এসেছে নম্বরগুলোর দিকে। তার মুখ থেকে একটা পেরেক নিচের দিকটাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করছে। সুইচ টিপলেই বৃত্তাকার কাঠটা প্রবলবেগে ঘুরতে আরম্ভ করবে কিন্তু ইস্পাতের ফলাটি থাকবে স্থির। তারপর সুইচ অফ করলেই গতি কমে আসবে কাঠের চাকতিটার। শেষে যখন একেবারে স্থির হয়ে যাবে তখন ইস্পাতের ফলাটির মুখ থেকে নামা পেরেক যে ঘরটাকে চিহ্নিত করবে সেই ঘরটির ওপর যদি টোকেন রাখা হয় তাহলে যত নম্বর ঘর ততগুণ পেমেণ্ট পাওয়া যাবে। স্রেফ ভাগ্য পরীক্ষা। এরই এমনি চেহারা দেখেছি পশ্চিম বাংলার গ্রামে গঞ্জে মেলায় মেলায়। এমনকি চা-বাগানের রবিবারের হাটেও সাঁওতাল মদেশিয়া কুলিদের পাঁচ দশ পয়সা এই খেলায় বাজি ধরতে দেখেছি।

মেয়েটি বই রেখে এবার উঠে দাঁড়াল। খুব রোগা মেয়ে। মুখশ্রী ব্রণের

প্রাবল্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এইরকম একটি মেয়েকে বিয়ে করে কিছু-দিন আগেও আমাদের দেশের সুপুত্রেরা বাড়ি ফিরতেন মেমসাহেব এনেছি বলে। হঠাৎ খেয়াল হলো, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে যে রেটে বাঙালি ছেলেরা পড়তে এসে মেমসাহেব বিয়ে করত এখন সেটা একে-বারেই কমে গিয়েছে। এর কারণ যদি ভাবা হয়, আমাদের ছেলেরা হয় চালাক-চতুর নয় বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে এখন, তাহলে খুশি হবার কারণ ঘটবে। কিন্তু উল্টোদিকে এই সাধারণ মেয়েরাও এখন ভারতীয় যুবকের চেয়ে নিগ্রো যুবককে বেশি গ্রহণীয় মনে করছেন সেটা না ভাবার কোনো কারণ নেই। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করবেন?' বেচারার গলার স্বর শুনে মনে হলো সকাল থেকে ভরপেট খাওয়া জোটে নি। বললাম, ওকে খুশি করতেই, 'আপনাকে দিয়ে আমার ভাগ্যটা যাচাই করলে কেমন হয়?' দ্রুত মাথা নাড়ল মেয়েটি, 'না। আমার ভাগ্যটা কিরকম তাতো বুঝতেই পারছেন। নইলে এইরকম ওয়েদারে আমাকে এই টুলে বসে থাকতে হয়!'

বাঃ। মেয়েটাকে ওপর থেকে দেখে যা মনে হয় তাতো নয়! এই সময়ে টগবগে এক যুবক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সদ্য ঢুকেছে সে। দশ নম্বর ঘরে এক পাউণ্ডের টোকেন রেখে সে চালাতে ইশারা করে বলল, 'আজকের দিনটা কেমন যাবে এটা থেকেই বুঝে নিই।'

মনে মনে নিজেকে হুঁশিয়ার করলাম। এরকম চালাকি আমি অনেক জানি। খদ্দের গাঁথবার জন্যে জুয়াড়ীরা সাজানো লোককে দিয়ে প্রথমে খেলিয়ে জিতিয়ে দেয় যাতে দর্শক প্রলুব্ধ হয়। হুইল ঘুরল বনবন করে। এইসময় যুবক বলল, 'স্টপ।' সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করল মেয়েটি আর হুইলটার গতি কমে আসতে লাগল। দশ নম্বর ঘরটা এক পাক দিয়ে পেছনে চলে গিয়ে আবার গতির টানে এগিয়ে আসছে ইস্পাতের ফলার দিকে। নাঃ। সেটা পেরিয়ে গেল এবং ইস্পাতের

ফলার পেরেক যে ঘরটাকে চিহ্নিত করল তাতে লেখা আছে,'সরি।' যুবক কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল অন্য টেবিলে। মেয়েটি টোকেন তুলে নিয়ে বাক্সে ফেলল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল,'টোকেন রাখবেনা ?' মাথা নাড়লাম, 'তোমার কাছে আমার ভাগ্যটা তো এখনই জানতে পারলাম।' হেঁটে গেলাম ওপাশের একটা কাচের বাক্সের সামনে। এখানে কোনো মেয়ে নেই। এক পাউণ্ড লাভ হলো। যুবকের বদলে আমি খেললে তো এক পাউণ্ড হারতাম। হারিনি সেটাই লাভ। প্রায় এক মানুষ লম্বা কাচের বাক্সটির তিনটে খোপ। তিন খোপে তিন রকমের তাসের ছবি। এক পাউণ্ডের টোকেন গর্তে ফেললে বাঁ দিকের খোপে আলো জ্বলে উঠবে। এবার বাঁ দিকের খোপের নিচে যে নবটা আছে তা তিনবার ঘোরানো যাবে। ঘোরানো মাত্র টেক্কা থেকে রাজার মধ্যে তাসের ছবি ফুটবে। সেই ছবিটিকে রেখে দুই এবং তিননম্বর নবদুটোকে তিন তিনবার ঘুরিয়ে যদি ট্রায়ো তৈরি করতে পারা যায় তাহলে তিরিশ ডলারের টোকেন বেরিয়ে আসবে। যদি জোড়া হয় দুই ডলার আসবে। নইলে কিছুই নয়। কিছুটা সময় নিয়ে ভেবে সরে এলাম। নাঃ, এটাও আমার নয়। লম্বা একটা টেবিল। টেবিলের এক প্রান্তে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক থেকে দশ নম্বর লেখা দশটি প্লাস্টিকের ঘোড়া। টেবিলের প্রান্তে ঘোড়ার নম্বর অনুযায়ী গর্ত রয়েছে। এক পাউণ্ড পছন্দমতো ঘোড়ার গর্তে ফেলে দিতে হবে। সুইচ টিপলেই রেস শুরু হবে। যে ঘোড়া জিতবে তার ওপর বাজি ধরলে পেমেণ্ট পাওয়া যাবে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম একবার এক নম্বর ঘোড়াটা জিতল। তার পরের বার পাঁচ নম্বর। তৃতীয়বার এক নম্বর। এইভাবে সাতটি রেসের মধ্যে চারবার এক জিতেছে এবং বাকি তিনটে দুই থেকে পাঁচের মধ্যে ভাগ হয়েছে। রেস হচ্ছে কম্প্যুটার মেশিনের মাধ্যমে। অঙ্কটা এমন গড়পড়তায় কোম্পানির ক্ষতি হবে না ওইভাবে এক জিতে গেলে।

যাই বলুন, এইসব দাঁড়িয়ে দেখায় এক ধরনের নেশা আছে। ভালো-মন্দ বিচার অন্য কথা। মানুষের রক্তে জুয়ার নেশা থাকবেই। যারা খেলছে পরিণতি জেনেই খেলছে।

একটা টেবিলে দেখলাম বেশ ভিড়। এক বৃদ্ধা টেবিলের ওপাশে, এপাশে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধার সামনে টোকেনের পাহাড়। অন্তত শ-পাঁচেক পাউণ্ড বলে মনে হলো। বৃদ্ধের সামনে পাউণ্ড পাঁচেক অবশিষ্ট। তাঁকে বেশ ভেঙে পড়া মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। যে দেখবে সেই বুঝবে ভদ্রলোক খুব হারছেন। দুটি লাল গেঞ্জি পরা মেয়ে টেবিলের দু'পাশে। তারা হিসাব রাখছে। যে জিতবে তাকে শতকরা পনেরো ভাগ ক্যাসিনোকে দিতে হবে। আরও ছ'সাত জন দর্শক আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখছে। তাদের কেউ কেউ বৃদ্ধকে বলছে,'ও জন' ইউ মাস্ট স্টপ।' জন মাথা নাড়ছে, 'নো নেভার।'

খেলাটা হলো বৃদ্ধা, যিনি জিতছেন, তাস সাফ্‌ল করে প্রতিপক্ষকে একটি এবং নিজে একটি তাস উল্টো করে দেবেন। জনকে দেখলাম তাসটি তুলে নিয়ে গোপনে হাতের আড়াল রেখে দেখল ওটা ছয়। টেবিলে বাজী বাবদ চার পাউণ্ডের টোকেন রাখা হয়েছে দু'পক্ষ থেকে। বৃদ্ধা নিজের তাস দেখে বললেন, 'কাম অন জন, তুমি কি সেকেণ্ড তাসটা নেবে?'

কোনো খেলোয়াড় যদি মনে করে তার তাসটা নয়ের অনেক নিচে তাহলে সে ইচ্ছে করলে দ্বিতীয়বার তাস তুলতে পারে। দ্বিতীয় তাস-টার নম্বর প্রথমটার সঙ্গে যোগ হবার পর মোট যে নম্বর হবে সেটাই তার নম্বর। জন কাঁপা কাঁপা হাতে দ্বিতীয় তাসটা তুলে নিল। সাত। অর্থাৎ সাত আর আগের ছয় মিলে হলো তেরো। তেরোর এক আর তিন জুড়ে চার। জনের নম্বর কমে গিয়ে হলো চার। জন যদি টেক্কা দুই অথবা তিন তুলতেন তাহলে নম্বরটা বেড়ে যেতো। বৃদ্ধাকে দেখলাম না দ্বিতীয়বার তাস টানতে। লাল গেঞ্জির মেয়েটি বলল,'শো ইওর কার্ডস।'

তাস দেখামাত্র বৃদ্ধা হাততালি দিয়ে টোকেনগুলো নিজের দিকে টেনে নিলেন। তাঁর তাসের নম্বর পাঁচ। জন যদি দ্বিতীয়বার তাস না টানতো তাহলে তিনিই জিততেন। এই তাসের প্যাকেটে সাহেব থেকে দশ পর্যন্ত তাসগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে। যার এক বা দুইবারে নয়ের কাছাকাছি হবে সেই জিতবে। হঠাৎ জন দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। সবাই ওঁকে বলতে লাগলেন বাড়িতে ফিরে যেতে। কিন্তু তিনি নড়ছেন না। বৃদ্ধা উসখুস করে বললেন, 'যদি তোমার খেলার টোকেন থাকে তাহলে আমি খেলতে পারি নইলে চলে যাচ্ছি।' জন হাত চোখ থেকে সরিয়ে এক পাউণ্ডের টোকেনের দিকে হাত বাড়ালেন। সেটাই তাঁর শেষ সম্বল। মানুষটাকে দেখে মায়া হচ্ছিল। মনে হলো বৃদ্ধা জনের ওপর এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করে জিতে যাচ্ছেন। তাছাড়া কার্ড লাক বোধহয় আজ ভালো নয়। কথায় আছে যার লাভ লাক ভালো তার কার্ড লাক ভালো হয় না। আবার সেইভাবেই উল্টোটা হয়। হঠাৎ জনের কাঁধে হাত রাখলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে কাতর চোখে তাকালেন। বললাম, 'তোমার হয়ে আমাকে দুটো দান খেলতে দেবে?'

'আমার হয়ে?' জন অবাক হলো?

'হ্যাঁ। তোমার এক আর আমার পাঁচ মোট ছ'পাউণ্ড খেলবো। যদি জিতি তুমি আমায় পাঁচ পাউণ্ড ফেরত দিয়ে দিও।' আমি হাসলাম। জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সম্ভবত তাঁর ওঠার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অসম্মানিত হবার ভয়ে উঠতে পারছিল না। জনের চেয়ারে বসে আমি তিন পাউণ্ডের টোকেন মাঝখানে এগিয়ে দিলাম। বৃদ্ধা আমার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বললেন, 'সো ইউ আর এ্যাক্টিং এ্যাজ এ জকি অফ জন? গুড লাক!' সাফল করে আমার দিকে একটা তাস এগিয়ে দিলেন মহিলা। আমি হাত বাড়ালাম।

তাসটা তুলে সামনে ধরতেই জনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে এলো।

টেক্কা। টেক্কা মানে এক। বৃদ্ধার তাস দুই থেকে নয় হলেই তিন পাউণ্ড হার। অতএব দ্বিতীয় কার্ডটা তুললাম। দুই। অর্থাৎ যোগফল তিন। পাঁচ থেকে নয় বৃদ্ধার হতেই পারে এবং দামটা পাওয়া গেল না। আমার ভাগ্য জনকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না। এসব ভেবেছি এক সেকেণ্ডের চেয়ে কম সময়ে। এবং তখনই গবুর কথা মনে পড়ল। তাস তুলেই এমন ভাব করত যেন সেরা তাস পেয়েছে। আমি শিস দিলাম এবং জিতে গেছি এই রকম ভঙ্গিতে জনের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধা এতক্ষণ সহজ ছিলেন নিজের তাস দেখে, এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। প্রতিপক্ষের নিশ্চিতভাব তাঁকে একটু টলালো। তাসের নম্বর বাড়াবার জন্যে দ্বিতীয় তাসটা টানলেন তিনি। লাল গেঞ্জি পরা মেয়েটি বলল, 'শো'। বৃদ্ধা তাস দিয়েছেন অতএব আমাকেই দেখাতে হবে। টেক্কা আর দুই দেখে উদগ্রীব দর্শকরা হতাশ-শব্দ উচ্চারণ করল। বৃদ্ধা তাস নামালেন। ছয় আর পাঁচ। দুটো মিলে এগার, এগার মানে দুই। আমি তিন আর বৃদ্ধা দুই। জন এমন গলায় চিৎকার করে উঠল যেন হাজার পাউণ্ড জিতেছে। আমার কাঁধে একটা চড় মেরে বলল, 'ক্যারি অন ব্রাদার।' কিন্তু ঘরে এলো তিন পাউণ্ড বাড়তি। আমি নিলাম না। আমার তিন বৃদ্ধার তিন, অর্থাৎ মোট ছয় পাউণ্ড মাঝখানে রেখে তাস টেনে নিলাম। যে দাম পাবে সেই দেবে। অভিজ্ঞরা বলেন, ভাগ্যলক্ষ্মীর দর্শন পাওয়া বিরল ব্যাপার। কিন্তু আচমকা যদি তিনি স্নেহবর্ষণ করেন তাহলে তার জের চলে কিছুক্ষণ। সেই সময়ের মধ্যে যা জেতার জিতে নিতে হয়। অতএব আমি এবার ছয় পাউণ্ড ধরলাম। নয় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মন বলল আর পেছনে তাকানো নেই। দেড়হাজার পাউণ্ডের টোকেন যখন আমার দিকে তখন বৃদ্ধা বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ জন, বাট আই উইল ট্রাই সাম আদার ডে।' বলে তিনি ধীরে ধীরে টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন। দর্শকরা তখন আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। জন

আমার বাজু ধরে যেন থরথর করে কাঁপছে। লাল গেঞ্জি পরা মেয়ে হিসেব করে ক্যাসিনোর কমিশন নিয়ে নিল। জনের হাত ছাড়িয়ে আমি বললাম, 'আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। চলি। জন যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'সেকি ? তোমার জেতা টোকেনগুলো নিয়ে যাও।' বললাম, 'আমি তোমার হয়ে খেলেছি। জিতেছ তুমি, আমি নই।' বলে নিজের তিন পাউন্ড তুলে নিলাম। দর্শকরা সম্ভবত ভাবছিল আমি সব টোকেন দাবি করব। কিন্তু ব্যাপারটা শোনার পর তারা হইহই করতে লাগল। সবাই জনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে খাওয়াতে বলছিল। জনের চোখ আমার দিকে। আমার খুব ভালো লাগছিল।

ক্যাসিনোটাতে তিনটে পাক দিয়ে পালকে খুঁজে পেলাম বার কাউন্টারে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর পাল গল্প করছে। ভদ্রলোক এই ক্যাসিনোর মালিক। শরীরের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে কিন্তু গলার স্বর তেজী। পাল আলাপ করিয়ে দেওয়া মাত্র ভদ্রলোক পেছন ফিরে বললেন, 'ওঁকে একটা ড্রিঙ্ক দাও এ্যালিস।'

হাতজোড় করলাম, 'না, এই সময়ে আমি মদ্যপান করি না।' লাল গেঞ্জি পরা একটি মেয়ে এগিয়ে এসেছিল, আমায় অপাঙ্গে দেখে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু বলল। বাল্যকাল থেকে তৃতীয়জনের সামনেও এভাবে কথা বলাকে অত্যন্ত অভদ্র ব্যাপার বলে ধরা হয় এবং সেটা ব্রিটিশরাই আমাদের শিখিয়েছেন। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে তো সবকিছুই মেনে নেওয়া যেতে পারে।

সন্দেশটি শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে তাকালেন, 'ইজ ইট ? আপনি একটু আগে কার্ডে দেড় হাজার পাউন্ড জিতেছেন ?'

'আমি নই, যার হয়ে খেলেছিলাম জিতেছেন তিনিই।' বলামাত্র লাল গেঞ্জি সপ্রশংস চোখে বলল, 'আপনি ব্যতিক্রম। আপনার মতো মানুষ আমি দেখিনি।'

আমি ঈষৎ মাথা নোয়ালাম। আজকাল বুঝেছি প্রশংসা পাওয়ার সময়

লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। ওটা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে হলো।

বৃদ্ধ আমাকে বসতে বললেন। ক্যাসিনোর হৈচৈ এখানে ভেসে আসছে না। ভদ্রলোকের নাম এড বায়রন। হেসে বললেন,'না না। কবির সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। কবিতা আমার আসেও না। পঞ্চাশ বছর ধরে ক্যাসিনোর ব্যবসা করছি। এবার বন্ধ করতে হবে। তোমাদের ইণ্ডিয়াতে ক্যাসিনো আছে ?'

মাথা নাড়লাম, 'না।'

'হুম্। ইণ্ডিয়ানরা খুব কনজারভেটিভ হয়।'

'এটা আমি ব্রিটিশদের সম্পর্কেও শুনেছি।'

'সে একটা সময় ছিল। তোমাদের দেশে আমাদের কিরকম চোখে দেখা হয় এখন ?'

'স্বাভাবিক। আর পাঁচটা বিদেশির মতোনই।'

'কোনো বিদ্বেষ নেই এতো বছর কলোনি করে রেখেছিলাম বলে ?'

'না। আমরা খুব দ্রুত ভুলে যেতে ভালবাসি।'

'আচ্ছা। শুনেছি ব্রিটিশরা চলে এলেও তোমরা তোমাদের বিচার ব্যবস্থা, পুলিশি ব্যবস্থা নাকি ব্রিটেনের প্যাটার্নেই রেখেছ। এটা ঠিক নয়।'

'কারো ভালো ব্যাপারটা গ্রহণ করতে আপত্তি কি ?'

'আপত্তি নেই। কিন্তু ধরো ব্রিটিশরা তাদের সুবিধের জন্যে উনিশশো একুশ সালে ভারতবর্ষে একটা আইন করেছিল। এখনও সেটাকে তোমরা আঁকড়ে থাকবে কেন ?'

এড সাহেবের কথা সত্যি বলে মনে হলো। প্রায়ই তো আমরা বলে থাকি এটা ব্রিটিশ আমল থেকে চলছে। খবরের কাগজে বের হয় পুলিশ কিছু করতে পারছে না কারণ এই ব্যাপারে ব্রিটিশদের করা আইনের পরিবর্তন হয় নি। কেন হয় নি তা কে বলবে ? কাগজে দেখলাম একটি মানুষ আর একটি মানুষকে হত্যা করলে যাবজ্জীবন

কারাবাস হতে পারে। কিন্তু জেনেশুনেও একজন আর একজনকে গাড়িচাপা দিলে দু'বছরের বেশি শাস্তি হয় না। এক্ষেত্রেও নাকি ব্রিটিশদের করা আইনকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। শুধু পুলিশি ব্যবস্থা, বা বিচার ব্যবস্থা কেন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজি সভ্যতা যে জায়গা নিয়েছে তা উপড়ে ফেলা মুশকিল। তবে মার্কিনী সভ্যতার প্রাবল্য সেটাকে করে তুলেছে দোআঁশলা। আমরা মোগলদের কাছে অনেকদিন শাসিত হলেও তাদের যতটা ম্লেচ্ছ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি তার চেয়ে অনেক নিবিড় করে নিয়েছি ইংরেজদের। এড বায়রনের মতো লোক সেসব কথা তুলে মনে মনে আনন্দ পেতেই পারেন।





৬

আমাদের আলোচনা অন্যখাতে ঘুরল। খুব অলসভাবে বোস্টনের পুরনোদিনের জাবর কাটছিলেন এড। সে এক সুখের সময় ছিল। তখন বড়দের ছোটরা মান্য করতো। স্ত্রীলোকরা স্ত্রীলোকদের মতোই ব্যবহার করতো। এত ভিড় ছিল না রাস্তায়। সম্ভ্রম হারিয়ে বেঁচে থাকার কথা মানুষ চিন্তাও করতে পারত না। হেসে বললাম, 'ইংলণ্ডে যে এতো এশিয়ান আফ্রিকানের ভিড় তার জন্যে দায়ী কিন্তু আপনারাই।'

'কেন?' এড অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আপনারা যদি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কলোনি তৈরি করার জন্যে বেরিয়ে না পড়তেন তাহলে সেইসব দেশের মানুষ এখানে আসার কথা ভাবতই না। একসময় ব্রিটেন তার কলোনি থেকে অজস্র সম্পদ তুলে নিয়ে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে আজ তো তার মূল্য কোনো না কোনোভাবে দিতেই হবে।' কথাগুলো এডকে খুব প্রসন্ন করলো বলে মনে হলো না। পাল উঠে দাঁড়াল, 'বলল, চলুন, আর একটু পাক

দিই।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এই আবহাওয়ায় রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙস ট্যাঙস করে ঘুরতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। এডকে বিদায় জানিয়ে ঘরের বাইরে এসে পাল বলল, 'যে মুদি আমার রেস্টুরেণ্টে জিনিসপত্র সাপ্লাই দেয় তার সঙ্গে আধঘণ্টাটাক বসব। আপনার একটু খারাপ লাগতে পারে—।'

'তার চেয়ে আমি ক্যাসিনোতেই অপেক্ষা করি আপনি যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে নেবেন!' হাঁটাহাঁটি থেকে বাঁচবার জন্যে চটপট বলে ফেললাম। এই সময় সেই লাল গেঞ্জি যে আমার প্রশংসা করছিল এডের সামনে এগিয়ে এল কাছে, 'হাই পল!'

পাল বলল, 'ইয়েস?'

লাল গেঞ্জি বলল 'তোমার বন্ধুর ব্যাখ্যা এডের ভালো না লাগলেও আমার পছন্দ হয়েছে।'

পাল হাসল, 'আমার বন্ধুর আর কি কি তোমার পছন্দ হয়েছে এ্যালিস?'

এ্যালিস বলল, 'তা কি করে বলব? আমি তো ওকে চিনিই না।'

পাল বলল, 'ওহো, আমি আলাপ করিয়ে দিই। সমরেশ আমার গেস্ট, ইণ্ডিয়া থেকে এসেছে, একজন লেখক আর এ হলো এ্যালিস, রিসার্চ করছে আর এখানে পার্ট টাইম কাজ করে।' এ্যালিস আমার দিকে হাত বাড়াল। মেয়েটির হাত বড্ড নরম। অথচ লম্বায় পাঁচ ফুট সাত আট তো হবেই। পাল চলে গেল। বলে গেল যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে। এ্যালিস বলল, 'এখানকার সবাই তোমাকে নিয়ে আলোচনা করছে। এরকম কাণ্ড কেউ এর আগে দ্যাখে নি। তুমি কি লেখ?'

'গল্প। তুমি কি নিয়ে রিসার্চ করছ?'

'আমি অঙ্কের ছাত্রী।'

ওরে বাব্বা। তাহলে তো তোমার বিষয় আমি কিছুই বুঝবো না।

কিন্তু অঙ্ক নিয়ে যে মেয়ে রিসার্চ করে সে কেন এই ক্যাসিনোয় কাজ করবে?'

'এখানে আমার মা থাকে। মাসখানেকের জন্যে মায়ের কাছে এসেছি। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কিছু রোজগার করা তো অনেক ভালো। লণ্ডনেও আমি রোজ বিকেলে ম্যাকডোনাল্ডে কাজ করি। আর ছ'-মাসের মধ্যে পেপার সাবমিট করতে পারব। তারপর ওটা এ্যাপ্রুভড হলে কোথাও পড়াতে যাব।' এ্যালিস হাসল। এবং তখনই তার ডাক পড়ল। হাত নেড়ে যাচ্ছে বলে সে আমায় জানাল,'ডিউটির সময় গল্প করা ঠিক নয়। আমার মায়ের বাড়ি তিন নম্বর বার্ক লেনে। সন্ধের পর চলে এস যদি কোনো কাজ না থাকে। বাই।' এ্যালিস চলে গেল।

খুব ভালো লাগল। তুলনা করে লাভ নেই। আমাদের দেশে সাধারণ কাজগুলোর পরিবেশ আমরাই এমন বিশ্রী করে রেখেছি যে ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে যেতে ভরসা পায় না। তাছাড়া যে দেশে বেকারের সংখ্যা অগুনতি সেখানে পকেটমানির জন্যে কোনো ছাত্র কাজ পাবে কি করে? এখনও এমএ পাস করেও অনেক মেয়ে মাত্র ছ'শ টাকায় খবরের কাগজ অথবা ছোটখাটো অফিসে চাকরি নিতে বাধ্য হয়। ছাত্রাবস্থায় যেটা ভাবতে চায় না তারা ডিগ্রি পাওয়ার পর সেটা মানতে অসুবিধা হয় না।

দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে খানিকটা এগোতেই দেখলাম দুটো হাত মাথার ওপরে তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে জন আমার দিকে ছুটে আসছে, 'হ্যালো জেণ্টলম্যান, আমি তোমাকে তখন থেকে খুঁজে মরছি। তুমি যে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে যাওনি সেটা বুঝতে পেরেছি বলেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি শেষ পর্যন্ত। আগে বলো তোমার নাম কি?'

নাম বললাম। জন তিনচারবার চেষ্টা করে বলল, 'সামরেশ। আমি তোমার কাছে প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ। না না তুমি না বলো না। খুব কাছেই আমার বাড়ি। সেখানে একবার তোমাকে যেতে হবে। কাম অন।' জন আমার হাত ধরল।

ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধ মানুষটির গলায় আন্তরিকতা ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কেন আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'তোমাকে নিজের হাতে কফি তৈরি করে খাওয়াবো বলে। তুমি কফি খাও তো?'

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এখন অকৃতজ্ঞ। বাকি অর্ধেকের নিরানব্বুই ভাগ ঠিকঠাক জানেন না কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। এক ভাগ জানেন। বৃদ্ধকে শেষ শ্রেণীতে ফেলব কিনা যখন ভাবছি তখন আমি ওভারকোট পরে রাস্তায়। বেরুবার আগে এডকে বলে এসেছি যেন তিনি পালকে জানিয়ে দেন ব্যাপারটা।

শীত আরও বাড়ছে। আসলে হাওয়া বাড়লেই শীত বাড়ে। দুপাশের বাড়িগুলোও যেন জবুথবু হয়ে রয়েছে। মাথা নিচু করে জন হাঁটছিল। হঠাৎ বলল, 'ইণ্ডিয়াতে সবসময় আলো ঝলমলে দিন, না? আচ্ছা সেখানকার বুড়োদের বড় আরাম!'

জনকে আমার খুব পছন্দ হলো এই একটা কথায়ই। কোনো ইংরেজের বাড়িতে এই প্রথম যাচ্ছি। ধরে নিতে পারি জনের ছেলেমেয়ে আলাদা থাকে। ওঁর স্ত্রী মিশুকে হলেই বাঁচি।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম। বাঁ হাতের তিননম্বর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বের করল জন। দরজা খুলে বলল, 'এসো।'

যত্ন করে আমার ওয়াটারপ্রুফ খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলো জন। তারপর আলো জ্বালতে লাগল একের পর এক। তিনখানা ঘর তার। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা বসার ঘরে বসলাম। ফার্নিচারগুলোর বয়স হয়েছে কিন্তু ওরা বেশ যত্নেই আছে। পৃথিবীর সমশ্রেণী সাপেক্ষে মানুষের বসবাসের ধরন বোধহয় একই। আমি এই বাড়িটিকে স্বচ্ছন্দে ইলিয়ট রোড রিপন স্ট্রীটের মধ্যবিত্ত বাড়ি হিসেবে

ভাবতে পারি। দেওয়ালে দুই বৃদ্ধবৃদ্ধার ছবি, একটা টিভি, সোফা-সেট, একটা ছোট কাচের আলমারিতে বইপত্তরের সঙ্গে কিছু টুকিটাকি, টেবিলে পরিষ্কার এ্যাসট্রে। জন কি ব্যাচেলার? বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। যতদূর জানি ব্যাচেলাররাই খুব খুঁতখুঁতে হয় এবং সেই কারণেই পরিষ্কার থাকে। আমাদের বন্ধু মুকুন্দ যেমন। তার ফ্ল্যাটে গেলে যে কোনো গোছানো মেয়ে ঈর্ষান্বিত হবেন। একটি ব্যাচেলার পঞ্চাশের কাছে এসেও রোজ ফুলদানিতে যত্ন করে রজনী-গন্ধা পাল্টায়, গোলাপ গাছ টবে পুঁতে জল দেয়, বিছানার চাদর এবং বালিশের ওয়াড়ে এক ফোঁটা ময়লা পড়তে দেয় না। আমাদের এক বন্ধুদম্পতির বাড়িতে মুকুন্দ একরাত ছিল। পরদিন সে চলে যাওয়ার পর বন্ধুপত্নী আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁদের বাড়ির পুরোনো এ্যাসট্রেটাকে মুকুন্দ ধুয়ে ঝকঝকে করে গেছে। এবং তখনই তিনি স্বামীকে সেটা দেখিয়ে ভর্ৎসনাসহ উপদেশ দিয়েছিলেন যেন মুকুন্দর কাছ থেকে জীবন কিভাবে যাপন করা উচিত তা শিক্ষা নেয়। বন্ধু আমায় টেলিফোনে এই খবর দিল্লি থেকে জানিয়ে বলেছিল, 'খবরদার কোনো ব্যাচেলারকে বাড়িতে ঢোকাবেন না।'

মনে হচ্ছে জন আর মুকুন্দর মিল আছে। দু'জনের বয়সের প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও।

দু কাপ কফি ট্রে-তে চাপিয়ে জন ঘরে এল। যত্ন করে একটি কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে দ্যাখো, পছন্দ হয় কিনা। তুমি নিশ্চয়ই চিনি বেশি খাও না?'

চুমুক দিয়ে ভালো স্বাদ পেলাম। মিষ্টি যদিও নেই বললেই হয়। মনে হলো একটু কষ্ট করি। শরীরের যত্ন তো নেওয়াই হয় না। তেতো কফি খেয়ে একটু সামঞ্জস্য আনা যাক। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এখানে একা থাকেন?'

'হ্যাঁ ভাই। ডিভোর্সের পর থেকে একদম একা।'

'ছেলেমেয়ে নেই ?'

'নাঃ। হয় নি।'

'কিছু যদি মনে না করেন, আজ অমন পাগলের মতো জুয়ো খেলছিলেন কেন ?'

'মাঝে মাঝে জেদ চেপে যায়। দেখো হে, জুয়ো খেলার ব্যাপারে আমি খুব সমঝে চলি। সারাজীবনের সঞ্চয় যা এখানে ওখানে ইনভেস্ট করেছি তা থেকে মাসের খরচ চলে যায়। জুয়োর জন্যে বরাদ্দ তিরিশ পাউণ্ড। আজকের ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। তুমি না এলে এই মাসটা আমাকে না খেয়ে থাকতে হতো।'

'জুয়োর জন্যে বরাদ্দ রেখেছেন যখন তখন বোঝা যাচ্ছে নিয়মিত জুয়ো খেলেন !'

'হ্যাঁ। নইলে সময় কাটবে কি করে ? আমি খুব ভোরে উঠি। কফি খেয়ে মর্নিং ওয়াকে বের হই। কাগজ নিয়ে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট বানাই। তারপর কাগজ পড়া শেষ হয় সকাল ন'টায়। তারপর তো আর কিছু করার নেই। বইপত্তর পড়তে ভালো লাগে না। কোনোকালে অভ্যেসও ছিল না। মাঝে মাঝে লাঞ্চ বাড়িতেই বানাই, বাইরেও খাই। দুপুরে ঘুম আসে না। শরীর উত্তেজনা চায়, সময় কাটাবার উত্তেজনা। এক পাউণ্ডের জুয়ো খেলি রোজ। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুম। বুড়োদের সঙ্গে মিশতে পারি না। প্রত্যেকের বুকে আফসোসের পায়রা বকম বকম করছে।' জন কফিতে চুমুক দিলেন।

'আপনি কিন্তু এক নয় কয়েকশো হারছিলেন আজ।'

'ঠিক। কিছুদিন হলো বাড়িতে সময় কাটানোর জন্যে রেসের ওপর গবেষণা করছিলাম। এটা খুব ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার। লণ্ডনে রেস হয়। এখানেও বুকি আছে। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত রেস খেলিনি। আগের দিন যেসব ঘোড়া দৌড়াবে তাদের লিস্ট নিয়ে বসি। আমার ফর্মুলা দিয়ে হিসেব কষি। রেসের পরে কাগজ পড়ে জেনে নিই

আমার পছন্দের ঘোড়াগুলো জিতল কিনা। রোজ সিক্সটি ফরটি মেলে। আজ কাগজ খুলে দেখলাম সবকটা মিলে গেছে। খুব আনন্দ হলো। আমি তো একটা পেনিও খেলিনি। কিন্তু ক্যাথি যখন চ্যালেঞ্জ করল তখন ভাবলাম রেস খেললে যখন গুডলাক হতো তখন তাসেও হারব না। উল্টো হয়ে গেল ফলটা।'

'লণ্ডনে রেস নিয়মিত হয়?'

'নিয়মিত মানে? সপ্তাহে অন্তত দু'বার গোটা পাঁচেক মাঠে রেস হয়। আমি এ্যারসনের মাঠটাকে ফলো করি। এই যেমন, আগামী সপ্তাহে ডার্বিতে 'সিওব চ্যাম্পিয়ন' নামের একটা ঘোড়া জিতবেই। আমার ফর্মুলা তাই বলে।'

জন থামতেই বেল বাজল। জন বলল, 'কে এল! এখন তো কারো আসার কথা নয়।' বললাম, 'আমি দেখব?'

আপত্তি করতে গিয়েও জন হেসে ফেলল. 'এ বাড়িতে আজকাল আমি ছাড়া আর কেউ দরজা খোলে না। দাও, ব্যতিক্রম হলে ভালো লাগবে আমার। তবে সেলসম্যান হলে বিদায় করো।' জন চলে গেল কিচেনে। এ বাড়ির দরজা জন ছাড়া কেউ খুলে দেয় না! দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভাবতে চাইলাম জন কি আফসোস করল?

দরজা খুলতেই চমকে উঠলাম। আপাদমস্তক ঢেকে রাস্তা ভেঙে এসেছেন কিন্তু মুখ আমি ভুলব কি করে? আমাকে দেখেও তিনি অবাক হলেন। হয়তো ঢুকবেন কিনা ভাবছিলেন, বললাম, 'আসুন।'

'জন নেই?'

'আছেন।'

'তাহলে তুমি দরজা খুললে কেন?'

'উনি একটু ব্যস্ত আছেন।'

পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন আমার দরজা খোলা তিনি অপছন্দ করেছেন। সেইভাবেই ভেতরে ঢুকলেন। বসার ঘরে ঢোকার আগে নিজের

ওভারকোট খোলার চেষ্টা করতেই আমি তাঁকে সাহায্য করলাম। তিনি একটা কাঠখোট্টা ধন্যবাদ দিয়ে সোফায় গিয়ে বসলেন। অবশ্যই ষাট পেরিয়েছে বয়স, একদা সুন্দরী ছিলেন এবং সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যবতী, এখনও প্রসাধন ও পোশাকে সেই চটক ধরে রাখার চেষ্টা আছে। বটুয়া খুলে আয়না বের করে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে নিলেন। আমার ভালো লাগছিল। বাঙালি মেয়েরা এককালে পঁয়ত্রিশ পার হলেই শাড়ির রঙ সাদার দিকে নিয়ে যেত। চল্লিশে প্রসাধনদ্রব্য ছুঁয়েও দেখত না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে বুড়ি বানাবার প্রতিযোগিতায় নেমে যেত। যদি তার তরুণী মেয়ে থাকত তাহলে তো কথাই ছিল না। আজ পঞ্চাশেও রঙিন শাড়ি হালকা মেক-আপ নেন সকলে। ষাটে সেটা করতে চান না। কেন চাননা তা বোঝা অসাধ্য। মেয়েরা, তিনি যে বয়সেরই হোন, সাজলে আমার ভালো লাগে। বাঙালি মেয়ে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে উঠেছে পঁচিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকতে থাকতে ষাট পর্যন্ত উঠতে দেখে যাব আশা রাখি।

ভদ্রমহিলা আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। উনি কেন এখানে এসেছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। জনকে খবর দেবো কিনা ভাবছি এইসময় জনের গলা পাওয়া গেল।

'ক্যাথি! কি বিস্ময়! তুমি?'

ভদ্রমহিলা লিপস্টিক বটুয়াতে ঢোকালেন, 'বিস্ময়ের কিছু নেই ওতে। প্রয়োজন হয়েছে বলে এসেছি। এই লোকটি তখন তোমার হয়ে না খেললে আসতাম না।'

জন এগিয়ে এল, 'সামরেশ, আলাপ করিয়ে দিই। সামরেশ ফ্রম ইন্ডিয়া আর ক্যাথি, ক্যাথলিন, আমরা একসময় স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, এখন আলাদা।'

ক্যাথি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পলের বাড়িতে উঠেছ?'

আমি মাথা নাড়লাম। খবরটা কোথায় পেলেন ইনি, এডের কাছে?

'তুমি খুব ভালো জুয়ো খেলো ছোকরা। তাসে আমি চট করে হারি না। তুমি না এলে এই বুড়োকে আমি মজা দেখিয়ে দিতাম। শোন জন, খেলাটা হচ্ছিল তোমার সঙ্গে আমার। তুমি একজনকে হায়ার করে জিতেছ। এই জেতাটা বেআইনি। আমার পাউণ্ড ফিরিয়ে দাও।' ভদ্রমহিলা তেজী গলায় বললেন।'

প্রতিবাদটা তখনই করলে চিন্তা করতাম, 'খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর এসব কথা তোলার মানে হয় না ক্যাথি।' জন উল্টোদিকের সোফায় বসল।

'কিন্তু আমার পাউণ্ড ফেরত চাই।'

'তোমার স্বভাব পাল্টালো না। শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তুমি জের টানো।'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। পাউণ্ড না পেলে তোমার বাড়ি থেকে আমি নড়ছি না। এখানেই আমি থেকে যাব।'

'তুমি থাকতে চাইলেই আমি এলাও করব কেন? আমার যে বয়স তাতে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে রাত কাটানো অসম্ভব।'

'তুমি আমাকে একটা উটকো লোকের সামনে অপমান করছ। একে তুমি ভালো করে চেনো না কিন্তু পাউণ্ডটা জিতিয়ে দিয়েছে বলে বাড়িতে ডেকে এনে কফি খাওয়াচ্ছো। অথচ আমাকে অফার পর্যন্ত করলে না।'

'সামরেশ উটকো লোক হতে পারে কিন্তু জেতার টাকাটা নেয় নি। এটাই ওর পরিচয় আমার কাছে। কফি অফার করলে তুমি খেতে না আমি জানি।'

'কেন? আমি আজকাল কফি খাই।'

'তাহলে ডিভোর্সের পর খাওয়া শুরু করেছ।'

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'জন, আমি চলি। পাল নিশ্চয়ই চিন্তা করবে।'

'আরে না না। তুমি তো এডকে খবর দিয়ে এসেছ।'

'তা হোক। আপনারা কথা বলুন।'

ক্যাথি বলল, 'আমাদের কোনো কথা নেই।'

জন হাসল, 'তোমাকে এ জীবনে বুঝতে পারলাম না ক্যাথি।'

কৌতূহল চাপতে পারলাম না, 'আপনারা কত বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন?'

'বাইশ।' জন জবাব দিলো।

'ডিভোর্স কবে হয়েছে?'

'আটমাস।'

'উনিও কি একাই থাকেন?'

'তাই তো শুনেছি। আমি যাইনি দেখতে।'

'শুনেছ মানে?' ক্যাথি ফোঁস করে উঠলেন, 'আমি মাইকের দোতলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে আছি তুমি জানো না?'

'মাইক তোমাকে কী শর্তে থাকতে দিয়েছে তা-তো জানি না। মেয়েদের ব্যাপারে মাইকের সুনাম আছে এটা একটা ক্রেশের বাচ্চাও বলবে না।'

'এই জন্যেই তোমার মুখ দেখতে নেই জন। হ্যাঁ,মাইকের চরিত্রে গোলমাল আছে। কিন্তু ভুলে যেও না ওর বয়স আশি।' বলা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ক্যাথি। তারপর বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, দেখি কি আছে কিচেনে!'

'ওঃ, নো। তুমি এখন আউটসাইডার, আমার কিচেনে ঢুকবে না।' জন ক্যাথির পেছন পেছন ছুটল। হতভম্বের মতো আমি দাঁড়িয়ে। ক্যাথির শরীরের তুলনায় জনকে খুবই খর্বকায় দেখাচ্ছিল। মারপিট হলে জনের হার অনিবার্য। ওদিকে কিচেনে জনের তর্জনগর্জন চলছে। ক্যাথির গলা পেলাম। 'পাউন্ডগুলো ফেরত দাও, আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

ঠনঠন করে কিছু পড়ার শব্দ হলো। তারপরেই জন ছুটে এলো এই ঘরে, 'মরে গেলেও আমি পাউণ্ডগুলো ফেরত দেবো না। চিরকাল আমাকে টাকা পয়সা নিয়ে বিব্রত করেছে ও। জীবনে কখনও শুনিনি ডিভোর্স হবার পরেও কোনো মেয়ে তার এক্স স্বামীর কিচেনে ঢোকে।' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল জন কিন্তু আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। জনের কপালে লিপস্টিক রাঙানো ঠোঁটের ছাপ স্পষ্ট। বেচারাকে খুব অসহায় লাগছিল। বললাম,'জন, মুখটা মুছে ফেলুন।' চট করে রুমাল বের করে মুখ মুছল জন,'ওই তো মুশকিল। ক্যাথি চুমু খেলে আমি কিছু বলতে পারি না। ডিভোর্সের আগে একবছর চুমু খায় নি তাই তো ডিভোর্সটা করতে পারলাম। আজ যে কি হবে তা ঈশ্বর জানেন।'

তবু, বাইরে ঠাণ্ডার ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে আমার কিন্তু ভালো লাগছিল। ক্যাথি নিশ্চয়ই যাওয়ার সময় তাঁর হেরে যাওয়া পাউণ্ড নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। কিন্তু আবার আসবে তো? যে অস্ত্রে জন ঘায়েল হয় তা যদি জানা হয়ে যায় তাহলে না আসার কোনো কারণ নেই কিন্তু এতগুলো বছর একত্রিত থেকেও ক্যাথি অস্ত্রটার কথা জানতো না তাই বা কেমন করে হয়!

পাল দাঁড়িয়েছিল ক্যাসিনোর দরজায়। বলল,'শুনলাম জনের বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।' হাঁটতে হাঁটতে ওকে ঘটনাটা বললাম।

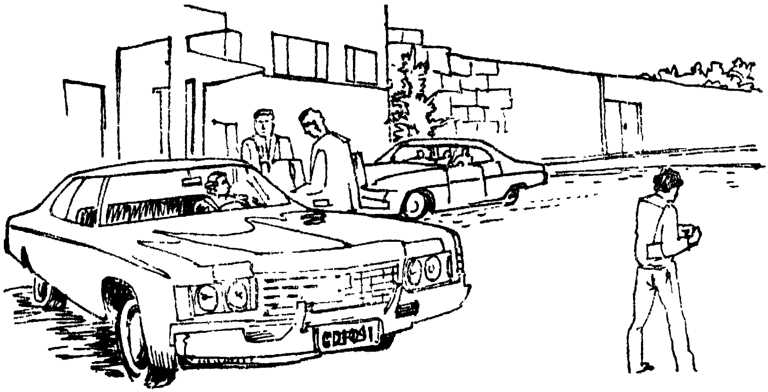
পাল বলল, 'বেচারা জন!'

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। আজ আর বের হচ্ছি না আমি। এর-মধ্যে সন্ধে নেমেছে আর বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে। চাদর মুড়ি দিয়ে পালের ভি সি আরে রবিনহুড সিরিজ দেখব বলে ঠিক করলাম। পাল বলল, 'কাল আপনাকে নিয়ে ব্ল্যাকপুলে যাব। সমুদ্রের গায়ে জায়গাটা। ভালো লাগবে। আজ কি রাঁধব বলুন।'

'যা খুশি।'

'ইলিশ আর ভাত।' পাল চলে গেল রান্নাঘরে। আমি ভি সি আর চালালাম। এ এক চিরকালীন রূপকথা। রবিনহুডের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে মজে গেলাম। হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা খুলে পাল বলল, 'আপনার সেই হিপিদের পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, জানেন?' মনটা খারাপ হয়ে গেল! সেই নব্যাহিপিনী মহিলার মুখ মনে এল। পুলিশ কি তাঁকেও অ্যারেস্ট করেছে? পঞ্চাশ পেরিয়ে জেলখানার ভাত খেতে হবে তাকে। আমি পালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানকার জেলে কি খেতে দেয় জানেন?' পাল হাঁ হয়ে আমার দিকে তাকাল, 'ভারতবর্ষের জেলগুলো তো ব্রিটিশদের করা। খাবার আলাদা হবার কোনো কারণ নেই। তবে আমি কোনোদিন থাকিনি তো তাই বলতে পারছি না।' এইসময় ফোন বাজল। পাল বাঁ-হাতে রিসিভার তুলে বলল, 'হেলো'।





৭

টেলিফোন নামিয়ে রেখে পাল বলল, 'মনে হচ্ছে আজকের রাতটা জমবে খুব।' জমে যদি জমুক তবে তার জন্যে আমি কিছুতেই বাড়ির বাইরে যাচ্ছি না। সামনে রবিনহুডের ছবি এখন উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। শেরউড ফরেস্টের গাছে গাছে তীরন্দাজরা উঠে বসেছে। আমি সেই-দিকে মন দিলাম। এই রবিনহুড আমি দেখেছিলাম জলপাইগুড়ির দীপ্তি টকিজে। তখন যে বালক মুগ্ধ হয়েছিল, যার কাছে যে কোনো নতুন জিনিসই মুগ্ধতা ছড়াতো, সে এখন অনেক পোড়খেয়ে, জীবনের অনেক ক্ষত এবং সামান্য সবুজ দেখে মধ্যবয়সে পৌঁছে চট করে মুগ্ধ-তাকে খুঁজে পায় না, তাকেও ছবিটি টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেবেলায়। অনেক ভেবে দেখলাম, যে মানুষের ছেলেবেলায় স্নিগ্ধতা নেই, এ্যাড-ভেঞ্চার নেই, বিস্ময় নেই, ভালবাসা নেই বাকি জীবনে সে কিছুই পেতে পারে না। কারণ পাওয়ার পর সেটার মূল্যায়ন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বোস্টোন শহরে বসে ইলিশ মাছ খাওয়ার অভিজ্ঞতা সত্যি চমকপ্রদ।

পাল বলল এখন এই মাছ আসছে সরাসরি বাংলাদেশ থেকে। লোকটি রাঁধেও চমৎকার। একটি বাঙালি ছেলে নিজের সমস্ত বাঙালিত্ব নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিশে প্রবলভাবে বেঁচে আছে, ভাবতেই খুব ভালো লাগছে। পালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানকার ইংরেজরা আপনাকে ঈর্ষা করে না?'

'করে। আমি বলে নয়, যে কোনো ভারতীয়কে এরা ঈর্ষা করে। আফ্রিকানরা এখানে এসে এখনও তেমনভাবে ব্যবসা করতে বসে নি কিন্তু গুজরাটি আর মাড়োয়ারিরা যেভাবে জুড়ে বসছে তাতে ভারতীয়কে দেখলেই এদের মন অপ্রসন্ন হয়। আর সেই কারণেই আমি এইসব বিক্রি করে দেশে ফিরে যাব ভাবি।'

আমি রাত্রে বের হব না বলতে পাল বিষণ্ন হলো। বলল, 'আরে মশাই, রবিবার থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত বাড়িতেই মুখ গুঁজে থাকি। দুটো দিন তো হাতে। তাও যদি বাড়িতে কাটাই তাহলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। ওয়েদারের কথা বলছেন? এখানকার ওয়েদার ওয়েদারের মতো থাকে, মানুষ মানুষের মতো।'

'তখন বেরিয়ে তো রাস্তায় মানুষ দেখলাম না। কেউ বের হয় নি।'

'কাল সারারাত জেগে আজ দিনের বেলায় সবাই ঘুমিয়েছে। ন'টার পর বাইরে বেরিয়ে দেখুন না কি কাণ্ড হয়।' পাল জানাল।

উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট। চিরকালই আমার মধ্যে কাণ্ড দেখার জন্যে একজন ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু পাল যাবে তার রেস্টুরেন্টে। সেখানে থাকবে বারোটা পর্যন্ত। তারপর আমাকে নিয়ে টহল দিতে বের হবে। রেস্টুরেন্ট বন্ধ হবার আগে সে আবার ফিরে যাবে। কিন্তু বারোটা পর্যন্ত রেস্টুরেন্টে বসে থাকতে হবে আমাকে। যদিও বিগ জন এবং সামির সঙ্গ আমার মোটেই খারাপ লাগে নি তবু সবাই যেখানে কাজ করছে সেখানে বসে থাকার মধ্যে একটা অস্বস্তি থাকেই। হঠাৎ এ্যালিসের কথা মনে পড়ে গেল। আজ এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা

ইংরেজের বাড়ি দেখেছি, এ্যালিস তো অল্পবয়সী। আমাকে নেমন্তন্নও করে রেখেছে। পালকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বার্ক লেনটা কোথায় ?'

'এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে হেঁটে গেলে একটা মোড় পাবেন। মোড়টা পার হয়ে কিছুটা যাওয়ার পর ডান হাতের রাস্তা। কেন বলুন তো ?'

'এ্যালিস আমাকে যেতে বলেছিল ওদের ওখানে।'

'বাঃ। তাহলে তো ভালোই হলো। আপনি ওদের ওখানে থাকুন সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। তারপর সোজা রেস্টুরেন্টে চলে আসবেন। বলেছে যখন তখন থাকবে নইলে এই রাতে কেউ সন্ধের পরে বাড়িতে থাকে না।' পাল আমাকে সদরের চাবি দিয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'আজ আপনার অনারে শ্যাম্পেন খুলব আমরা। যাঁরা মদ ভালবাসেন তাঁরা শ্যাম্পেনের কথা খুব একটা বলেন না। খানদানী মানুষেরা তাঁদের আভিজাত্য প্রমাণের জন্য শ্যাম্পেন খান। জিনিসটি মোটেই দামী নয়। কিন্তু সম্মান পায়। আমি কলকাতার সুরারসিকদের কাছে স্কচের গল্প শুনতাম। আমার এক লেখকদাদা স্কচ ছাড়া খেতেন না। বিয়ার খেতেন নিউজিল্যান্ডের। মাঝে মাঝে আমাদের দরাজ দিলে সেগুলো খাওয়াতেন। যে কোনো বিদেশি জিনিসের মতো কলকাতায় স্কচ পাওয়া যায় অঢেল। এবং অবশ্যই ভারতীয় সেরা মদের চেয়ে তার দাম বেশি। হঠাৎ এক সকালে দাদার মাথা ধরল। আগের রাত্রে পরিমিত স্কচ খেয়েছিলেন তিনি। মাথা ধরার কারণ নেই। একটি ইংরেজি পত্রিকার ডাক সাইটে সম্পাদক তাঁকে জানালেন এদেশের স্কচগুলোতে এখন দিশি মাল মেশানো হচ্ছে। দশটার মধ্যে সাতটাই জাল। খেতেই যদি হয় তাহলে দিশি রাম খাওয়াই ভালো। জ্যামাইকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। অতএব দাদা এখন রাম খাচ্ছেন নাক টিপে। যাহোক, কলকাতার সুরারসিকরা স্কচ বা সুরার মধ্যে যাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন তার নাম হলো রয়াল স্যালুট।

ভারতবর্ষে ওর একটা বোতলের দাম নাকি দু' আড়াই হাজার। সেই মহার্ঘ বস্তু কোনোদিন চেখে দেখিনি। হঠাৎ আমাদের চা-বাগানের বন্ধু, যাঁকে আমরা আলাদীনের গল্পের দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করতাম, যিনি মধ্যরাত্রে এক চা-বাগানে সমরেশ বসুর জন্মদিন শুনে এক ঘণ্টার মধ্যে শিভ্যাস রিগ্যালের বোতল আনিয়েছিলেন, তিনি কলকাতার হোটেলে উঠে জানালেন যে রয়াল স্যালুট খাওয়াবেন। নিমন্ত্রিতের মধ্যে আমিও ছিলাম। পান করে মনে হলো না খুব দামি কিছু খাচ্ছি। আমেরিকা ইংলণ্ডে এসে যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি রয়াল স্যালুটের কথা সেই অবাক হয়েছে। কেউ নামই শোনে নি কেউ বলেছে ওটা আবার মদ নাকি। প্রচারের কল্যাণে কিনা জানিনা সেই জিনিস ভারতবর্ষে এক নম্বর। খানিকটা সেই অভিজ্ঞতার মতো, কলকাতার বই-এর স্টলে জেমস হ্যাডলি চেজ খুব জনপ্রিয়। নিউ ইয়র্কের স্টলে তাঁর বই চাইতে প্রশ্ন শুনেছিলাম, 'হু ইজ হি?' মদ নিয়ে মারাত্মক রসিকতার গল্প লিখে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব। অতুলনীয় সে-সব। পড়ার সময় লোকগুলোকে মোটেই ভিলেন বলে মনে হয় না। অথচ পঁচিশ বছর আগের বাঙালি কেউ মদ খাচ্ছে শুনলে নাক কোঁচকাতো। বাড়িতে বসে মদ খাওয়ার কথা ভাবতে পারত না। ওইসব গল্প পড়েও। আজ কোথাও পার্টি হচ্ছে জানলে লোকে প্রথমেই জানতে চায় ওটা ককটেল কিনা? আসলে মদ খাওয়া আর মাতলামি করা যে দুটো আলাদা ব্যাপার সেই বোধ ক্রমে ক্রমে কিছু মানুষের মনে ছড়িয়েছে। ভালো মন্দ নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত তর্ক করা যেতে পারে।

এসব কথা মনে হয়েছিল এ্যালিসের বাড়িতে গিয়ে। দরজা খুলেছিল সে। খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। নরম হাত। তারপর টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভেতরের ঘরে। এখন এ্যালিসের পরনে একটা জিনসের প্যাণ্ট আর নীল পুলওভার। ভেতরের ঘরে তখন টিভির সামনে বসেছিলেন এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ ও রমণী। দুজনেই পান করছিলেন।

এ্যালিস পরিচয় করিয়ে দিলো, 'আমার মা রীতা আর আমার সৎ বাবা টম।'

দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। রীতা জিজ্ঞাসা করলেন,'আমি কিছু নেব কিনা?' আমি মাথা নেড়ে না বলতে দ্বিতীয়-বার অনুরোধ করলেন না। মহিলা বেশ সুন্দরী, সুন্দর ফিগার। এ্যালিসের মা বলে মোটেই মনে হয় না। মেয়েরা বয়স বাড়লে মুখের মেয়ানত যতই সূক্ষ্মতাব নিয়ে যাক, বুক কোমর এবং নিতম্বের স্বরূপ লুকিয়ে রাখতে পারে না। এ্যালিস যদি ওর মেয়ে হয় তাহলে ঈশ্বরকে আর একবার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। টম বললেন,'এ্যালিসের কাছে শুনেলাম আপনি লেখক। সত্যি বলতে কি একজন লেখককে আমি প্রথম দেখছি। লেখকরাই বোধহয় উদার হয়ে জেতার টাকা ছেড়ে দিতে পারে।' হাসলাম। বলতে পারলাম না লেখক এবং উদারতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার একটা পঞ্চাশ টাকার বই এক বছরে ছ'টা সংস্করণ হয়েছে শুনে বাংলা সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় লেখক সেই প্রকাশককে লিখেছিলেন, 'এখন থেকে আপনারা তাহলে সমরেশ মজুমদারের বই ছাপুন, আমাকে কি দরকার!' আর একজন দাদা স্থানীয় লেখক বলেছিলেন, 'ওরকম সংস্করণ আমি ঢের দেখেছি। খোঁজ নাও, হয়তো দু'শো কপিতে সংস্করণ করেছে।' অতএব লেখক যদি বাঙালি হন তাহলে উদারতা আশা করা এই দশকে অন্তত সোনার পাথরবাটির মতো অসম্ভব।

ওঁদের সঙ্গে গল্প জমে গেল। যার আমন্ত্রণে এসেছি সেই এ্যালিস বসে রইল চুপচাপ। রীতার প্রথম পক্ষের মেয়ে এ্যালিস। এ্যালিসের বাবার সঙ্গে বিয়ের পর রীতা ভালোই ছিলেন। মানুষটি মারা যায় বিমান দুর্ঘটনায়। তখন ওরা লণ্ডনে থাকতেন। সেই সময় স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। মানুষটি ভালবাসার ক্ষেত্রে সততা দেখান নি। বিয়ের দিন কিছু প্রমাণ পেয়ে রীতা সরে আসেন। তার-

পর দীর্ঘকাল একা। একবছর আগে মেয়েকে নিয়ে ব্ল্যাকপুলে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই টমের সঙ্গে আলাপ। ওকে দেখামাত্র তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছিল। এ্যালিস সেটা লক্ষ্য করেই হয়তো বলেছিল, 'টম তোমার সম্পর্কে আগ্রহী। ওকে স্টেপ ফাদার হিসেবে ভাবতে আমার খারাপ লাগছে না মা।' টমের ব্যবসা এই বোস্টনে। বিয়ের পর এখানেই থাকেন, স্বামীকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করেন। এ্যালিস ছুটি পেলেই চলে আসে। এসব কথা হচ্ছিল একটু একটু করে গল্পের সূত্র ধরে। মাঝে মাঝে এ্যালিস উঠে যাচ্ছিল। পৃথিবীর সব দেশের মেয়েই সম্ভবত বাবা-মায়ের অন্তরঙ্গ গল্প শুনতে লজ্জা পায়। লক্ষ্য করছিলাম টম এবং রীতা মাঝে মাঝে পরস্পরকে আদর করছিলেন। এটা এমন আদর যা আমরা প্রকাশ্যে করতে সঙ্কোচ বোধ করি অথচ তাতে কোনো যৌনতা নেই। যে আদর ছেলে বা মেয়েকে সবার সামনে করা যায় সেই একই আদর স্ত্রীকে করতে গেলে এখনও আমরা আড়াল খুঁজি। টম বা রীতা সেই জড়তা থেকে মুক্ত। ব্যাপারটা আমারও খারাপ লাগছে না। রীতা কখনও টমের কাঁধে হাত রাখছেন, টম কথা বলতে বলতে একটা আঙুল রীতার গালে বুলিয়ে দিলেন। দুই পুরুষ এবং রমণী যে জীবনের অনেক সমস্যা অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন তা আচরণে বোঝা যাচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা আজ বের হবেন না?'

টম বললেন, 'এরকম ওয়েদারে আমি রীতার সঙ্গে ঘরে থাকতে পারলেই খুশি হব।' বলে একটা চোখ টিপলেন। রীতা মাথা দুলিয়ে বললেন, 'আমিও।'

টম এবার হঠাৎ সচেতন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট এ্যাবাউট এ্যালিস?'

এ্যালিস পোশাক পালটে তখনই ঘরে এল, 'আমি বরং বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' রীতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি বাইরে ডিনার করবি?'

'দেখি।' এ্যালিস দ্বিধায় পড়ল।

'দেখি-টেখি না। তুই যদি বাড়িতে খাস তাহলে আমরা অপেক্ষা করব।'

এ্যালিস বলল, 'নাঃ। বাইরেই খাব।'

ওঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমিও এ্যালিসের সঙ্গে বাইরে এলাম। বৃষ্টি নেই। হাওয়া দিচ্ছে। তাতে শীত যেন আরও বেড়েছে। এ্যালিস জিজ্ঞাসা করল,'তোমার কোনো প্রোগ্রাম আছে ? আমি কিছু না জিজ্ঞাসা করেই বেরিয়ে এলাম।'

'কিছু না। সাড়ে এগার থেকে বারোটার মধ্যে পালের রেস্টুরেণ্টে যাব। ওখান থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করব, ব্যাস। তুমি আমাদের সঙ্গে খেতে পার।'

যদিও রাত্রের খাওয়া পালের কল্যাণে সন্ধেবেলাতেই হয়ে যায় তবু গত রাতের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি ঘণ্টা সাতেক পরেই আবার খিদে পেয়ে যায়। আর এখানে শুক্র-শনিবারে অনেকেই ভোর তিনটের সময় ডিনার করে।

আমরা পাশাপাশি হেঁটে চলেছি শহরের ডাউনটাউনের দিকে। এ্যালিস জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মাকে তোমার কেমন লাগল ?'

'খুব ভালো।'

'সুন্দরী না ?'

'খুব।'

'টমকে দেখার আগে পর্যন্ত মা এমন দুঃখী ছিল যে আমার কিছু ভালো লাগত না। মনে মনে খুব ভেঙে পড়েছিল মা। টম ওকে অনেকগুলো বছর ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি টমের কাছে কৃতজ্ঞ।' আনন্দিত গলায় বলল এ্যালিস।

'তোমার হিংসে হয় না ?'

'ওমা, কেন ?'

'তোমার মাকে টম কেড়ে নিয়েছে বলে !'

'ওঃ নো। হিংসে হবে কেন ? মা দিন দিন বিমর্ষ হয়ে পড়ছে, জীবন সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই এটা কোন্ সন্তানের ভালো লাগে। তারপর আমিও বড় হয়েছি। চাকরি পাওয়ার পর বিয়ে করব তখন মায়ের কি হবে? টম তো সবদিক থেকে মাকে জীবন ফিরিয়ে দিলো। আর মা তো আমাকে একফোঁটা কম ভালবাসে না। ভালবাসা শেয়ার করার কথা বলছ ? তুমি লেখক, তুমি নিশ্চয়ই জানো মেয়েদের ভালবাসা হলো সমুদ্রের মতো। কখনই কমে না।'

ওরকম বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম বলে নিজেই লজ্জিত হলাম। আমরা সৎ বাবার সঙ্গে সন্তানের সুসম্পর্ক দেখতে তেমন অভ্যস্ত নই বলেই চিন্তাটা মাথায় এসেছিল। দুজনে পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি পৌঁছাতেই থমকে গেলাম। মনে হচ্ছে ওপাশের রাস্তা জুড়ে মার-পিট হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বীভৎস রকমের চিৎকার করছে দলে দলে। আমাকে থামতে দেখে এ্যালিস জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?' আমি বললাম, 'ও পাশে কোনো গোলমাল হচ্ছে।' এ্যালিস গলা খুলে হেসে উঠল, 'আরে না। ওরা শনিবার এনজয় করছে। বন্ধু-বান্ধব মিলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।'

সেই রাত্রে বোস্টনের রাজপথে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হলো। ফুট-পাতগুলো ওই ঠাণ্ডাতেও পনের থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়েদের দখলে। তারা চিৎকার করছে, গান গাইছে হেঁড়ে গলায়। কেউ বিয়ার খাচ্ছে টিনে মুখ ডুবিয়ে, কেউ নাচছে। ফুটপাতের একটা দল যে. গলায় চিৎকার করছে অন্যদল তার চেয়ে বেশি শব্দ করছে। এবং এরা যে খুব শান্তশিষ্ট তা মোটেই নয়। হঠাৎ একজন ফুটপাত ছেড়ে ছুটে এলো রাস্তায়। ট্র্যাফিক পুলিশের খালি স্ট্যাণ্ডটাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো একপাশে। তারপর ছুটে গেল নিজের দলে। দুপাশের ছেলেমেয়েরা কপট ভয়ার্ত চিৎকার করে ছুটে যেতে লাগল আশে-

পাশে। দেখলাম চারটে পুলিশ তেড়ে আসছে মোটর সাইকেলে চেপে। অকুস্থানে ব্রেক কষে নেমে ওরা শান্ত ভঙ্গিতে ট্র্যাফিক স্ট্যাণ্ডটাকে তুলে নিয়ে এসে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলো। কিন্তু কাউকে তাড়া করল না। এ্যালিসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুলিশ নিশ্চয়ই এবার খুব ঝামেলা করবে?' এ্যালিস মাথা নাড়ল, 'না। আজকের রাত্রে ওরা এই-সব ঠাট্টা ইয়ার্কিকে প্রশ্রয় দেয়। বেশি কিছু করলে আলাদা কথা।'

আমরা আর একটু হেঁটে দঙ্গলটার মধ্যে আসতেই একটি মেয়েলি গলা চিৎকার করে উঠল, 'এ্যালি! এ্যালি!'

মুখ তুলে বাঁদিকে হাত নাড়ল এ্যালিস। দেখলাম একটা বিশাল স্তম্ভের ওপর বসে পা ঝুলিয়ে বিয়ার খাচ্ছিল একটি মেয়ে, হাত নাড়া মাত্র সে লাফিয়ে চলে এলো নিচে। অত ওপর থেকে লাফাল কিন্তু কিছুই হলো না ওর। দৌড়ে কাছে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' এ্যালিস কাঁধ ঝাঁকাল, 'তুমি একা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু খারাপ লাগছে না।'

এ্যালিস আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো, 'টিনা, ওই ক্যাসিনোতেই কাজ করে। আজকে ওর ছুটি ছিল।'

টিনা বলল, 'এ্যালিস খুব ভালো মেয়ে। তবে মুশকিল হলো ওর সমস্ত বন্ধু ঠিক দ্বিগুণ বয়সের।' বলে বিয়ারের ক্যানটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। হয়তো পরিবেশের প্রভাব, আমি ক্যানটাকে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে এ্যালিসকে অফার করলাম। এ্যালিসও আধ চুমুক নিয়ে টিনাকে ফিরিয়ে দিলো। এখন এই তল্লাটে যৌবনের মেলা বসেছে। আগামী কালের ছুটিটাকে আজ উপভোগ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই রাস্তায় বেরিয়ে। এরকম উৎসবী মেজাজ আমি আগে কখনও দেখিনি। চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকারা চুম্বন করছে কিন্তু কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। টিনা বলল, 'তোমরা তো এদিকে যাচ্ছ। ফেরবার সময় আমাকে ডেকো।' আমি তাড়াতাড়ি আমার জায়গায়

চলে যাই নইলে কেউ দখল করে নেবে।' টিনা ছুটল স্তম্ভের ওপরে উঠতে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'টিনার বয়ফ্রেন্ড নেই ?'

'ছিল। বাচ্চা হবার পর সে চলে গিয়েছে।'

'টিনার বাচ্চা আছে ?' মেয়েটাকে আমার বিবাহিত বলে ভাবতেই ইচ্ছে করল না। তারপরেই মানির কথা মনে পড়ল। এখানে কুমারী মায়ের সংখ্যা বাড়ছে।

'হ্যাঁ। দেড় বছর বয়স। ও যখন সিক্সটিন প্লাস তখন হয়েছিল।'

'বাচ্চাটা কোথায় ?'

'ওদের কাছেই। ও মায়ের সঙ্গে থাকে।'

'বিয়ে হয় নি ?'

'না।' বলে হাঁটতে হাঁটতে এ্যালিস বলল, 'আমি এটা পছন্দ করি না।'

'কেন ?' এই প্রথম মেয়েটাকে অন্যরকম চোখে দেখলাম।

'বিয়ের আগে বাচ্চা হলে ঝামেলাটা একা শেয়ার করতে হয়। কিন্তু তা হবে কেন ? দুজনের ইচ্ছেতেই তো বাচ্চা হয়েছে। অতএব সেই কারণেই বিয়ের পর বাচ্চা হওয়া উচিত। তোমার কি তাই মনে হয় না ?' এ্যালিস তাকাল।

মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল। আমি হয়তো এ্যালিসের মুখে একটি ভারতীয় নারীর সংলাপ আশা করেছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বয়স কতো এ্যালিস ?'

'বাইশ'।

'বিয়ে করনি কেন ?'

'চাকরি করার আগে বিয়ে করব না। রিসার্চ না করলে হয়তো চাকরি করতাম।'

'কিছু মনে করো না, তোমার স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে ?'

'ওমা মনে করব কেন ? হ্যাঁ, আছে। ও আমার মতো রিসার্চ করছে লণ্ডনে।'

'তাহলে আমি কি মনে করতে পারি তোমার সেক্স এক্সপেরিয়েন্স আছে ?'

'ও সিওর। আমি পনের বছর বয়স থেকে ডেটিং করেছি।'

'ওই ছেলেটির সঙ্গে ?'

'না, না। ওর সঙ্গে তো আমার কলেজে পড়তে গিয়ে আলাপ।'

আমার জেদ চেপে গেল, 'ছেলেটি সে-সব জানে ?'

'নিশ্চয়ই। ও নিজেই ওইরকম এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে বড় হয়েছে।'

'তাতে তোমার খারাপ লাগে না ?'

'বাঃ। খারাপ লাগবে কেন ? কিন্তু যেদিন আমরা স্বীকার করেছি যে পরস্পরকে ভালবাসি সেদিন থেকে আমরা পরস্পরের কাছে সং আছি। অতীতকে নিয়ে কে মাথা ঘামায় যদি না সেই অতীত বর্তমানকে বিব্রত করে।'

ঘড়িতে এখন রাত বারোটা। এ্যালিসকে নিয়ে রেস্টুরেণ্টের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই বিগ জন হাসিমুখে ওয়েলকাম বলে দরজা খুলেই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই ব্রাদার, তুমি এত বড়লোক তাতো জানতাম না।'

'মানে ?' বিগ জনের থাবার আদরে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

পেছনে সরে গিয়ে একটা বিশাল কেক নিয়ে এল বিগ জন, 'তোমার জন্যে এই উপহার এসেছে। তুমি নাকি কয়েকশ পাউণ্ড জিতেও ছেড়ে দিয়েছ। বড়লোক না হলে কেউ পাউণ্ড ছাড়ে !'

বিগ জনের কথা রেস্টুরেণ্টের অনেকেই শুনতে পাচ্ছিল। তারা উৎসুক হয়ে আমায় দেখল। পাল এগিয়ে এল কাউণ্টার ছেড়ে, 'ক্যাথি এসেছিল আপনার খোঁজে। যাঁকে আপনি তাসে হারিয়েছিলেন। কেকটা দিয়ে গিয়েছে সঙ্গে এই কার্ডটা।' দেখলাম কার্ডের ওপরে লেখা রয়েছে, 'গ্রেটফুল টু ইউ, বোথ অব আজ।'

রাত একটায় আমি আর পাল রেস্টুরেণ্ট থেকে বের হলাম। আজও

খুব ভিড়। আজকের জন্যে একজন অতিরিক্ত লোক নিয়েছে পাল। ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিচ্ছে সে রেস্টুরেণ্ট থেকে সবাইকে বলে এল। এ্যালিসকে ভারতীয় খাবার খাইয়েছি। বেশি রাত করবে না বলে সে বাড়ি চলে গিয়েছে। যাওয়ার আগে লণ্ডনে তার ঠিকানা দিয়ে গেছে আমায়। আগামী সোমবার সকালে সে লণ্ডনে ফিরে যাবে। মেয়েটি খুব শান্ত, ভদ্র এবং অবশ্যই শিক্ষিত।

আমরা দু'জন রাস্তায় বেরিয়ে একটু হাঁটলাম। এখন ঠাণ্ডায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পাল বলল,'চলুন. ক্লাবে নিয়ে যাই আপনাকে।'

বললাম, 'আমার জন্যে রেস্টুরেণ্ট ছেড়ে এলেন, খারাপ লাগছে।'

পাল হাত নাড়ল, 'আপনার জন্যে কে বলল? নিজেরই তো ইচ্ছে করছিল একটু ফুর্তি করি। তাছাড়া সন্ধেবেলায় একজন ফোন করেছিল, মনে নেই?'

বিশাল বাড়ির গেটে ইউনিফর্ম পরা ডোরম্যান দাঁড়িয়ে। সে পালকে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার। রেস্টুরেণ্টে কোনো ট্রাবল নেই তো? বিগ জন ঠিক আছে?'

উত্তরগুলো দিয়ে সিঁড়িতে উঠে পাল আমায় বলল,'এ হলো ডোরমেন ক্লাবের এ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি।' চেহারা দেখে সেইরকমই মনে হয়। আমরা দোতলায় উঠতেই চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। নাচ চলছে উদ্দাম। সবই মধ্যবয়স্ক পুরুষ রমণী। ক্লাবের মালিক এগিয়ে এসে পালকে কিছু বললেন। চেঁচামেচিতে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। ওপাশে নাচতে চাইছে না এমন একটি মহিলাকে অনুরোধ করে যাচ্ছে এক যুবক। পাল নৃত্যরতদের পাশ কাটিয়ে তেতলার সিঁড়িতে চলে এল। অনেকগুলো ঘর এপাশ ওপাশে। সবখানেই নাচগান চলছে। আমরা শেষ পর্যন্ত যেখানে পেঁছালাম সেটা একটা বারকাউণ্টার এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত। বারম্যান পালকে দেখে উল্লসিত। পাল দুটো ভদকা উইদ টনিক বলে জুড়ে দিলো, 'তুমিও একটা নাও।' লোকটা

খুশি হলো। এখানে একটা মদ চাইলে যে পরিমাণ দেয় তা কলকাতার আধ পেগ। ভালোই। খাওয়া কম হয়।

লোকটা মদ খেতে খেতে কাউণ্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাকে অনেকদিন পরে এখানে দেখলাম পাল। ক্লাবের সেই যুগ তো আর নেই।'

পাল দু-একটা কথা বলে আমায় জানাল, 'এই ক্লাবে বাইরের লোক ঢুকতে পারে না। একমাত্র মেম্বাররাই গেস্ট আনতে পারেন। তবু দেখুন ভিড় বেড়েই চলেছে।' ঠিক সেই সময় দুজন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ রমণী প্রবেশ করলেন। প্রথমজন একটু খাটো কিন্তু বেশি সুন্দরী। দ্বিতীয় জন বেশ লম্বা এবং স্বাস্থ্যবতী, লাবণ্যটা কম। পালকে দেখে তাঁরা উচ্ছ্বসিত। আলাপ হবার পর পাল বলল, 'আজ আমার বন্ধুর সম্মানে আমরা শ্যাম্পেন খুলব।' সঙ্গে সঙ্গে বাকেটে বরফের মধ্যে ঢোকানো শ্যাম্পেনের বোতল এল। শব্দ করে ছিপি খোলা হলো কিন্তু বস্তুটি উপচে পড়ল না। তারপর শ্যাম্পেনের গ্লাসে গ্লাসে সেটি বিতরিত হলো। চুমুক দিয়ে আমার মোটেই পছন্দ হলো না। খাটো মহিলার নাম এ্যান, দ্বিতীয়জন মার্গারেট। এ্যান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করেন?' জবাব দিলাম। শোনামাত্র তারা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচায়ি করল। তারপর বলল,'একটু আস্তে বল। তোমার উচ্চারণ আমি বুঝতে পারছি না।' আমরা বাঙালিরা যে ধরনের ইংরেজিতে অভ্যস্ত ছিলাম ইদানিং তার পরিবর্তন ঘটেছে। আমেরি-কান শব্দ এবং উচ্চারণের ভঙ্গি এসেছে খুব দ্রুত। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রায় প্রতি পদেই হোঁচট খাচ্ছিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারটা জন, ক্যাথি, এড কিংবা এ্যালিসের সঙ্গে কথা বলার সময় অনুভব করিনি কেমনভাবে। পাল সমস্যাটা বুঝতে পেরে বাংলায় বলল, 'এরা খুব গোঁড়া ব্রিটিশ। আমেরিকান ইংরেজি শুনলেই না বোঝার ভান করে। আপনি চালিয়ে যান।'

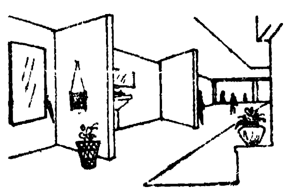
ক্রমশ আমি আর মার্গারেট কথা শুরু করলাম। এ্যান গল্প করছে পালের সঙ্গে। আমি কথা বলছি খুব কেটে কেটে, সন্তর্পণে। মার্গারেটের স্বামী এই শহরের দু'নম্বর পুলিশ কর্তা। আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরবে না বলে সে বেরিয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে। এ্যানের এসব কোনো সমস্যাই নেই। কোনো পুলিশ অফিসারের স্ত্রীর সঙ্গে মধ্যরাত্রে গল্প করা মোটেই সুখদায়ক ব্যাপার নয়। আমার যত অস্বস্তি হচ্ছিল তত যেন মার্গারেটকে গল্পে পেয়ে গেল। সেক্সপীয়ার আমাদের বন্ধু, শেলী কিটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ বায়রনকে বাল্যকালেই পড়তে হয় শুনে সে চমকিত। বলল, 'তাহলে তো তোমাদের দেশে গিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আমি আমার স্বামীকে বলব ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে। কিন্তু ও খুব গোঁড়া, তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি জানলে ক্ষেপে যাবে।'

শুনে আমারও ভালো লাগল না। ওদিকে পাল আর এ্যান একটা ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। পাল বলল, 'সমরেশ, এ্যান জামাইকান রাম খেতে চাইছে। এখানে পাওয়া যায় না। আমার বাড়িতে আছে। আপনি ওদের নিয়ে যান। আমি রেস্টুরেন্ট ঘুরে আসছি।' এ্যান ব্যাপারটা মার্গারেটকে বলল। মার্গারেট দোনমনা করছে। যাওয়ার জন্যে আমরা তৈরি। সরল মনে আমি মার্গারেটকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর ইউ কামিং?' সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটম বোম ফাটল যেন। প্রচণ্ড রেগে গেল সে। আর এ্যান হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। কি অপরাধ করলাম বুঝতে পারলাম না। এত স্পষ্ট উচ্চারণ করেছি যে মার্গারেটের ভুল বোঝা উচিত নয়। মার্গারেট আর এক মুহূর্তও থাকতে চাইল না। এ্যান তাকে সামলাতে চেষ্টা করেও বিফল হলো। এ্যান বলল, 'সরি পাল, শী ইজ ক্রেজি। ও আর থাকবে না। আমার আজ জামাইকান রাম খাওয়া হলো না। নেক্সট টাইম খাওয়া যাবে। গুড নাইট।' ওরা চলে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পাল বলল, 'কি করলেন বলুন তো!'

অপরাধীর গলায় বললাম, 'কি করেছি তাই বুঝতে পারছি না। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাদের সঙ্গে আসছে কিনা!'

'পাল হাসল,'আপনার দোষ নেই। আমরা ছেলেবেলায় বই-এর ইংরেজি ওভাবেই শিখেছি। তুমি কি আসছ? আর ইউ কামিং? আপনি যদি কাম এর বদলে গো ক্রিয়া ব্যবহার করতেন তাহলে এই গোলমালটা হতো না। নরনারীর বিশেষ মুহূর্তে সাধারণত ওই প্রশ্নটা একে অন্যকে করে যা আপনি করেছেন। চলুন।'

হেসে ফেললাম। ক্লাব থেকে বেরিয়ে মনে হলো আমাদের বাংলা ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ আছে যা আপাত নিরীহ, শুধু ব্যবহার করার দৌলতে তার মানে পালটে যায়। অথবা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে করে কিছু শব্দ বা বাক্যকে তার নিজস্ব অর্থ নস্যাৎ করে অন্য চেহারা দিয়ে দিয়েছি আমরা। স্রোতের মধ্যে যে নেই সেটা তার পক্ষে জানা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু জানার পর তো আমার উচিত মার্গারেটের কাছে ক্ষমা চাওয়া। সেটা শুনে পাল বলল, 'পাগল! ছাড়ুন তো।'





৮

শনিবারের মতো রবিবারও শহরটা ঘুমোয় দুপুর অবধি। তফাৎটা হলো, শনিবারের রাত্রে যেমন রাস্তা জুড়ে হইচই, ক্লাবে রেস্টুরেণ্টে উপচে পড়া ভিড়, রবিবারে কিন্তু সব ফাঁকা। বেশিরভাগ দোকানপাট ক্লাব বন্ধ। এদিন প্রয়োজন জরুরি না হলে কেউ বাড়ি ছেড়ে বের হয় না। কারণ দু-রাত হুল্লোড়ের পর সবাই বিশ্রাম নিয়ে তৈরি হয় আগামীকালের জন্যে। সোম থেকে শুক্র এখানকার মানুষ কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ব্যাপারটা আমরা কেন ভাবতে পারি না? আধুনিক ভাবনা চিন্তা যা আমাদের মগজে এসেছে তা তো সব বৃটিশদের কাছ থেকেই পাওয়া। দুশো বছরে ওরা এতো কিছু করল আর আমাদের মনে কাজ করার ইচ্ছেটাকে তৈরি করতে পারল না। মানলাম, এদেশে নিজেদের প্রয়োজনে ওরা রাস্তাঘাট শহর তৈরি করেছে, শাসনব্যবস্থা শক্ত করার জন্যে আমাদের শিক্ষিত করেছে ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু এইসব করতে গিয়ে ওরা আরও অনেক কিছু দিয়ে ফেলেছে যা আমাদের ছিল না। তবে কেন শৃঙ্খলাবোধ এল

না? যার জন্যে পৃথিবীর ছোট ছোট দেশগুলো যা করতে পারে আমরা তা পারি না।

কিছুদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলাম। মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটু আড়ষ্ট হয়েছিলাম। লেখাটার বিষয়বস্তু এইরকম। এক বণিক ব্যবসা করতে নতুন দেশে গেল। গিয়ে দেখল তার জিনিস কেনার সামর্থ্য সেখানকার কয়েকটি ধনী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই দেশে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, দেশপ্রেম নেই, কয়েকটি পরস্পরবিরোধী শক্তি শুধু ক্ষমতা দখলের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। বণিককে কেউ পছন্দ করল না কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ প্রশ্রয় দিতে লাগল। বণিক দেখল তাকে ওরা ওদের কলহের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছে। এবং তখনই সে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেল। একটু বুদ্ধি ব্যবহার করে সে দেশটির মালিক হয়ে গেল একদিন। অর্থাৎ চোদ্দ আনা যদি পড়ে থাকে তাহলে তা তুলে নিতে কোন্ মূর্খ দ্বিধা করবে? পৃথিবীতে তো কেউ বিবাগী হতে জন্মায়নি! তাহলে এই বণিককে কি সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করা উচিত? ভারতবর্ষে মোগলরা যেভাবে ঢুকেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঠিক সেইভাবে ঢোকেনি। বলা যেতে পারে আমরাই তাদের অন্দরমহলে ডেকে এনেছিলাম। আজ বৃটিশদের গালাগাল দেওয়ার সময় সেই সময়কার ইতিহাস ভাবতে অবশ্য ভালো লাগে না। এবং যদি দুশো বছর একটি শক্তির অধীনে একত্রিত না থাকতাম তাহলে আজ আসাম থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আমরা জাতীয় সংহতির বাজনা বাজাতে পারতাম না। উল্টোটা হলে দারুণ কিছু ঘটতো এমন আশাবাদী মানুষ থাকতেই পারেন, কিন্তু যেটা সত্যি তা হলো স্বদেশকে আপন বলে ভাবা তো দূরের কথা নিজের কাজটাকে যত্ন করে করার মানসিকতাই অধিকাংশ ভারতীয়ের নেই। এখন তো আমরা ঠিকঠাক আনন্দ করতেও জানি না।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে পাল আর আমি বের হলাম। আজ বৃষ্টি নেই। রোদও ওঠেনি। হাওয়া চলছে সেই সঙ্গে শীত। নিজেকে যতটা সম্ভব মুড়ে নিয়েছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোতলা বাসে উঠলাম। গাড়ি নিতে আমি পালকে নিষেধ করেছি। বাসে উঠে বসতে পেলাম। রবিবারে এরকম ঘটনা কলকাতায় ঘটে থাকে। টিকিট পঞ্চাশ পেনি। দূরত্ব মাইল দেড়েক। টাকার হিসেব করলে তা এগার টাকায় চলে যাবে। অতএব পঞ্চাশ পেনিকে পঞ্চাশ পয়সা ভাবাই ভালো। শহর-টাকে একটা চক্কর মেরে বাস থেকে আমরা নামলাম রেলওয়ে স্টেশনের সামনে। বাইরে থেকে দেখে সেটা বোঝা যায় না। শুধু সাইনবোর্ড পড়ে এগিয়ে যাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এই মফস্বলী স্টেশন-টিতে সুন্দর কাউণ্টার আর ইণ্ডিকেটার বোর্ড দেখতে পেলাম। কোন্ ট্রেন আজ ছাড়বে কখন আসবে তা জিজ্ঞাসা করতে ছোটাছুটির কোনো প্রয়োজন নেই। পাল টিকিট কিনে বলল, 'চলুন ভেতরে গিয়ে কফি খাই। মিনিট কুড়ি দেরি আছে।' আমার হাতে সদ্য জ্বালানো সিগারেট। ইংলণ্ডে সিগারেটের দাম অত্যন্ত বেশি। পার্ক স্ট্রীট পাড়ায় যে সিগারেট আমরা পনের টাকায় পাই তা এখানে বাইশ টাকা। কিন্তু যেহেতু আমাকে দাম দিতে হচ্ছে এক পাউণ্ড এবং এক সংখ্যাটা মনকে প্রফুল্ল রাখে তাই আপাতত গায়ে লাগছে না। টিকিট পাঞ্চ করিয়ে ঢোকার সময় কর্মচারিটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'রেলওয়ে বিশ্বাস করে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব আপনি যদি ওই বস্তুটিকে না নিয়ে ঢোকেন তাহলে সুবিধা হয়।' কুড়ি মিনিট সিগারেট ছাড়া বিশেষ করে সদ্য ধরানো সিগারেট ফেলে দিতে আমি রাজি হলাম না। পালকে এগিয়ে যেতে বলে আমি কাউ-ণ্টারের সামনে ফিরে এলাম। সেখানে মোটেই ভিড় নেই। এক সর্দা-রনী দ্রুত টিকিট নিয়ে ভেতরে চলে গেল। দেখলাম একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতে বিগলিত

হাসি ফুটল তার মুখে। শুধু মুখ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। পরনে ঢলঢলে প্যাণ্ট, ওভারকোট। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপের সঙ্গে মাফলার। সঙ্গে বিরাট একটা ঝোলা। লোকটি এগিয়ে এসে সুন্দর উচ্চারণে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভারতবর্ষ' থেকে আসা হচ্ছে না বাংলাদেশ ?' বললাম 'ভারতবর্ষ।'

'কোন্ ভাষা মাতৃভাষা ?'

'আপনি কি ভারতীয় ?'

'বাঙালি তো ? বুঝতে পেরেছি। বাঙালি ছাড়া কেউ প্রশ্ন করে জ্বালায় না। হ্যাঁ গো, আমি বাঙালি, সুভাষ বোস রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ। পড়ে আছি এই হতচ্ছাড়া দেশে। যাব ব্ল্যাকপুল। টিকিটের দাম কম পড়ে যাওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আর অমনি তোমায় দেখলাম। একটা পাউণ্ড দাও তো, অভিলাষ পূর্ণ করি।' হাত বাড়ালেন তিনি। এইসব কথাবার্তা বাঙলাতেই এবং আমাকে স্বচ্ছন্দে তুমি বলছেন ভদ্রলোক। বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি করেন ?'

'সেবা।' ভদ্রলোক হাসলেন,'ইংলণ্ডের গ্রামে শহরে ঈশ্বরের নাম বিলিয়ে বেড়াই। এই পোশাক দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছো তুমি ? মাঙ্কি ক্যাপটা খুললেই বুঝতে পারতে কিন্তু তাতে আমার শীত লাগবে। এই ঠাণ্ডার জন্যেই গৌরাঙ্গ বিলেতে জন্মায়নি, বুঝলে! দাও দিকিনি।

'এক পাউণ্ড মানে বাইশ টাকা। দেশে একজন অপরিচিত মানুষের কাছে এভাবে বাইশ টাকা চাইতে পারতেন ? আপনার শিষ্য-শিষ্যা নেই ? তাদের কাছ থেকে নিন।'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। পরপর গোটা পাঁচেক প্ল্যাটফর্ম। পাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে টিভি দেখছিল। আমায় বলল, 'হিপিরা লণ্ডনে যেতে চেয়েছিল। পুলিশ আপত্তি করেছে।'

অবাক হলাম, 'ওরা কি এখনও হাইওয়ে ছাড়েনি ?'

'না। তবে ওরা শেরউড ফরেস্টের দিকে পেঁছে গেছে। ওখানেই আপাতত থাকবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,শেরউড,শব্দটা আগেও শুনেছি। রবিনহুডের জঙ্গল ! সেটা এখনও এখানে আছে ?' আমার ভালো লাগল।

'হ্যাঁ। চলুন, ট্রেন আসছে।'

ঠিক সময়ে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। এত ফাঁকা ট্রেন আমি কখনও দেখিনি। নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাওয়ার আমেরিকান ট্রেনে যথেষ্ট ভিড় ছিল। একেবারে প্রথমদিকের কামরায় উঠে জানলার পাশে বসলাম। একটু অভিনব ব্যাপার। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখোমুখি চারটে আসনের মাঝখানে একটা সাঁটা টেবিল রয়েছে। পড়ালেখা খাওয়ার কাজে সেটাকে দিব্যি ব্যবহার করা যায়। কলকাতার লোকাল ট্রেনে টেবিল পাতার কল্পনা স্বাভাবিক কারণেই কারো মাথায় আসে না। এইসময় সেই ঈশ্বরপুত্রকে দেখতে পেলাম। ট্রেনের টিকিটের দাম পেয়ে না গেলে উনি এই প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পারতেন না। এখন কামরায় নজর বুলিয়ে শিকার খুঁজছেন যাতে যাত্রাটা একটু আরামের হয়। পালকে বললাম ওঁর কথা। পাল বলল, 'আমার রেস্টুরেন্টেও প্রত্যেক সপ্তাহে একজন আসে। ল্যাঙ্কাশায়ারে কালীবাড়ি বানাবে। ওটা এমন একটা ব্যাপার চাঁদা না দিয়ে পারা যায় না। যাই বলুন বাঙালি হিন্দুদের কালীঠাকুরের ওপর একটা দুর্বলতা আছেই।

ইংলণ্ডের মাঠ চাষের ক্ষেত্র কলকারখানা দুপাশে রেখে ট্রেনটা এগিয়ে যাচ্ছিল স্টেশনগুলোকে বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কামরার ভেতরে মেশিন-জাত উত্তাপ খুব আরাম দিচ্ছিল। আমাদের দুটো কামরা পরেই স্ন্যাক্সকার। গরম চা কফি থেকে টুকিটাকি সব খাবার বিক্রি হচ্ছে সেখানে। যার যেমন ইচ্ছে কিনে নিয়ে এসো। ট্রেন যাত্রা এত আরামের তা ভাবতেই আরও চমক লাগে যখন দেখি দ্বিতীয় শ্রেণীর টয়লেটে

শুধু ফ্ল্যাশই কাজ করে না, সেখানে টয়লেট পেপারও ঠিকঠাক মজুত থাকে। প্রায় আড়াই-ঘণ্টার যাত্রা শেষ হলো যে জায়গায় তার সঙ্গে সকরিকলি মণিহারি ঘাটের বেশ মিল আছে। উত্তরবঙ্গে যেতে হলে আগে গঙ্গার ধারের এই স্টেশনগুলোতে ট্রেন আসার আগেই মাটি দেখে আমরা টের পেয়ে যেতাম। একটু একটু করে মাটির রঙ পালটে যেত। শেষে ছাড়া ছাড়া ঘাসের ফাঁক দিয়ে বালি উঁকি দিত। শেষ-তক বাতাসে মিশে থাকা জলের গন্ধ আমরা পেয়ে যেতাম।

ট্রেনটা যেখানে থামলো সেখানে কোনো বাড়িটাড়ি নেই। একটা স্টেশন যেন থাকতে হয় বলেই আছে। তায় প্ল্যাটফর্মেও কোনো মানুষজন দেখছি না। কামরা থেকে নামার পর কোনো রেলের কর্মচারিরও দর্শন পেলাম না। একটা রঙিন ড্রামের বুক পকেটে সবাই টিকিট ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরা কি ধরেই নেয় যারা ট্রেনে উঠবে তারা টিকিট কাটবেই! পাল অবশ্য অন্য কথা বলল। আজকে যে এমন নিরিবিলি, চারধারে শিথিলভাব তার কারণ একটাই, ছুটির দিন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তায় আমরা হাঁটছিলাম। দু-পাশে পাঁচিলে ঘেরা জমি। ভবিষ্যতে যাঁরা বাড়ি করবেন এখানে তাঁরা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। জলের গন্ধ বাড়ছিল। এবার বেশ কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। সরলরেখার মতো অনেকদূর চলে গেছে বাড়ি-গুলো। ক্রমশ আমরা মোটামুটি শহুরে এলাকায় ঢুকে পড়লাম। পাল বললো, 'চলুন, দুপুরের খাওয়াটা এখান থেকেই সেরে নিই। তাহলে আর সমস্যায় পড়তে হবে না।'

বললাম, 'যে জন্য এসেছি সেই সমুদ্র কোথায়?'

পাল বলল, 'ওই বাড়িগুলোর সামনে। কিন্তু সেখানকার রেস্টুরেন্ট-গুলোর ফিফটি পার্সেন্ট দাম বেশি।' আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই বাড়িগুলোব পেছনেই। এতো কাছে এসে সমুদ্র না দেখে খেতে বসতে কারো ইচ্ছে হয়? তবু নিজেকে সামলালাম। এরকম কৌতূহলের

জন্যে জীবনে অনেকবার খুব হতাশ হতে হয়েছে আমাকে। সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম দুজনে। মহিলারা পরিবেশন করছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সুন্দরীতমা তাঁর টেবিলেই বসলাম আমরা। রোস্ট চিকেন আর রুটির অর্ডার দিয়ে পাল বলল,'আপনি বিয়ার খাবেন ?' বাইরে রোদ নেই তেমন,ঠাণ্ডাটাও জমকালো, এই আবহাওয়ায় বিয়ার খাওয়ার ইচ্ছে হলো না।

যে মহিলারা পরিবেশন করছেন তাদের জীবিকা এটাই এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। জীবনের অন্য ক্ষেত্রে কিছু উদ্বৃত্ত সময় এখানে ব্যয় করে উপার্জন করছেন এঁরা। কিন্তু পরিবেশনকারিণী বড্ড বেশি আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। পালও সেটা লক্ষ্য করছিল। খাবারের প্লেট নিয়ে তিনি টেবিলে আসতেই পাল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।' মহিলা আমাদের দিকে তাকালেন না। দক্ষ হাতে খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বললেন,'সমস্যাটা আমার নয়,আপনাদের। একটু বাদেই টের পাবেন।' কথা বলার সময় এমন ভঙ্গি করলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেও বোঝা যাবে না তিনি আমাদের কিছু বলছেন। পাল আর আমি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। সুন্দরী ততক্ষণে ফিরে গিয়েছেন নিজের জায়গায়। এবার লক্ষ্য করলাম শুধু তিনিই নন রেস্টুরেন্টের সমস্ত কর্মচারি আমাদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে। ব্যাপারটা এমন অস্বস্তিকর যে খাবার উপভোগ করা আর হয়ে উঠলো না। পাল বলল সে-ও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

কফির ভাবনা আমিই বাতিল করলাম। বিল দিতে বললাম। সুন্দরী সেটা এগিয়ে দিয়ে জানালেন,আমরা যেন অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করি। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'একজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

যেহেতু আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন এবং আমার প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করলেন না অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। ব্ল্যাকপুলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতে পারে এমন কাউকে তো আমার চেনার কথা নয়। পালকে বললাম, 'আমি রহস্য বুঝতে পারছি না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

পাল মাথা নাড়ল, 'না। ওরা ভদ্রভাবে অনুরোধ করেছে যখন তখন শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক কি হয়।' এই সময় একটি স্বাস্থ্যবান লোক এগিয়ে এলো। লোকটাকে আমার মোটেই রাগী বলে মনে হলো না। 'হেলো' বলে চেয়ার টেনে বসলো। কাউণ্টারের সামনে ললনারা দাঁড়িয়ে সাগ্রহে আমাদের দেখছে। লোকটি আমার দিকে একপলক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ভারতীয় ?'

মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও ?' লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। তোমার নাম ?'

বললাম। লোকটা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আবার উচ্চারণ করতে বলল। ফের নামটা বললাম। লোকটা মাথা নাড়ালো। তারপর হাত বাড়াল, 'তোমার পাশপোর্ট দেখতে পারি ?'

'কারণ না বললে আমি দেখাতে বাধ্য নই।'

'একটি ভারতীয় আমাদের কিছু অসুবিধায় ফেলেছে। সে যে ঠিকানা বলেছে সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেছে ওটা ফল্‌স। তার চেহারার সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে। অথচ তুমি যে নামটা বলছ তার সঙ্গেও ওর নাম মিলছে না। এমন হতে পারে নামটাও বানানো। সেটা তোমার পাশপোর্ট দেখে নিশ্চিত হতে চাই।'

পাল এবার জিজ্ঞাসা করলো, 'লোকটা কিছু অন্যায় করেছিল ?'

'হ্যাঁ। আমার বোন রেস্টুরেণ্টে কাজ করত।—না এই রেস্টুরেণ্টে নয়। লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়। ওরা প্রেমে পড়ে। তারপর না জানিয়ে

লোকটা উধাও হয়ে যায়। এখান থেকে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে তোমার সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে।' লোকটা হাত বাড়িয়েই ছিল।

'তুমি সেই লোকটাকে দ্যাখোনি।' পাল জিজ্ঞেস করল।

'না তখন আমি বাইরে ছিলাম।'

এবার আমি সোজা হয়ে বললাম, 'সবচেয়ে ভালো হয় যদি তোমার বোন এখানে আসে। সে নিশ্চয়ই তার প্রেমিককে চিনতে পারবে।'

'তার পক্ষে এখন আসা সম্ভব নয়। কাল রাত্রে তার বাচ্চা হয়েছে।'

প্রথমে অস্বস্তি, তারপর বিরক্তি শেষে কৌতুক বোধ করছিলাম এতক্ষণ, কথাটা শোনার পর মন খারাপ হয়ে গেল। পাল জিজ্ঞাসা করল তবু, 'তোমার বোন কি বিবাহিতা? লোকটা মাথা নাড়ল, না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'বাচ্চাটাকেও পৃথিবীতে আনতে চেয়েছে। আমাদের কথা কানেই তোলেনি।'

বিনাবাক্য ব্যয়ে আমার পাশপোর্ট তুলে দিলাম। লোকটা ছবির সঙ্গে নামটা পড়ল। অর্থাৎ আমি যে নাম বলেছি সেটা সত্যি বুঝতে পেরে ইশারায় সুন্দরীকে ডাকল। সুন্দরী এলেন। লোকটা তাকে পাশপোর্ট দেখাল। সুন্দরী অনেকক্ষণ আমার মুখ এবং পাশপোর্টের ছবি দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমি মাত্র একবার দেখেছিলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে সেই লোকটা আলাদা।'

পাল বলল, 'এবার আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে বলতে পারি। এটা শুধু অনর্থক ঝামেলাই নয় অপমানও। কিছু বলতে চাও?'

লোকটা কাঁধ নাচাল, 'হ্যাঁ, সেটা তোমরা করতেই পার। কিন্তু তার আগে আমাদের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা কর।'

খারাপ লাগছিল যেমন অবাকও হচ্ছিলাম সেইসঙ্গে। এসব তো অসভ্য দেশে সম্ভব যেখানে একজন বিদেশি এসে কদিনের ঘনিষ্ঠতায় এই-রকম কাণ্ড করে স্বচ্ছন্দে মেয়েটিকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে। বেচারা মেয়েটি হয় আত্মহত্যা করে নয় সারা জীবন বেদনা বহন করে।

কিন্তু ইংলণ্ডের একটি সামুদ্রিক শহরে সেটা সম্ভব হয় কি করে ? আমরা উঠে পড়লাম। লোকটিও। বাইরে বেরুবার সময় শুনলাম সুন্দরী বলছেন, 'আমি দুঃখিত।' কথা বাড়ালাম না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি এখানে বেড়াতে এসেছ ?'

পাল বলল, 'আমি এদেশেই থাকি। আমার বন্ধু বেড়াতে এসেছে।'

লোকটা জানতে চাইল, 'আমি যদি তোমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকি তাহলে অসুবিধা হবে ?'

পাল আমার দিকে তাকাল। আমি উলটোটাই বললাম, 'মোটেই না। থাকলে আমরা খুশিই হব। নতুন জায়গায় গাইড করতে পারবে।' বুঝতে পারছিলাম আহাম্মুকি আচরণের জন্যেই লোকটা একটু ভালো ব্যবহার করতে চাইছে এখন।

বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হাওয়ার মুখে পড়লাম। এবং সমুদ্র দর্শন হলো।

আদিগন্ত প্রায় স্থির জলরাশি। শুধু উড়াল হাওয়ার দাপটে ভাঙা ভাঙা ছোট ঢেউ তার বুকে ছড়ানো। জলের রঙে সবুজের ছোঁয়াই বেশি। এমন স্থির বিপুল সমুদ্র আমি কখনও দেখিনি। জ্যাকেটের সবকটা বোতাম আটকেও মনে হচ্ছে হাড়ে শীত ঢুকছে। আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যে ফুটপাতে তার সামনে বিশাল চওড়া রাস্তা। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গিয়েছে। এদিকে পর পর দোকান-পাট রঙিন করে রেখেছে, যতদূর দৃষ্টি যায়। উলটোপিঠে সমুদ্রের গায়ে ভাসমান মেলা, রেস্টুরেন্ট, বার। এইসবে একবার নজর বোলাতেই কার্নিভাল শব্দটা মাথায় আসে। লোকটা বলল, 'তোমাদের কি বোটিং করার ইচ্ছে আছে। তাহলে বল, আমার এক বন্ধু নৌকা ভাড়া দেয়।'

একে এই ঠাণ্ডা বাতাস তার ওপর সমুদ্রের জলে ভাসতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। পাল এখানে কয়েকবার এসেছে। ট্রেনে বসে ওর মুখে শুনেছি দেশ থেকে কেউ বেড়াতে এলে তাকে নিয়ে একবার

ব্র্যাকপ্‌লের সম্‌দ্র আর লেকডিস্ট্রিক্টে ওকে যেতেই হয়। এই কথাই নিউইয়র্কে মনোজ বলছিল। ওকে যে কতবার বাফেলোতে যেতে হয়েছে নায়েগ্রা দেখাতে। তার ফলে নায়গ্রা সম্পর্কে ওর কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট নেই। আমার মনে হলো এবার পালকে বেশি হাঁটাহাঁটি না করানোই উচিত। ওকে কোথাও বসে অপেক্ষা করার প্রস্তাব দিতে সে খ্‌শি হলো। সামনেই একটা লম্বা টাওয়ারের ওপর কাচের দেওয়ালের রেস্টুরেণ্ট। পাল জানাল সে ওখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এক মাইল দ্‌র থেকে যখন ওই টাওয়ারটাকে দেখা যায় তখন আমার হারিয়ে ফেলার কোনো ভয় নেই।

লোকটার নাম বব। বলল, ব্যবসা করে। কিসের ব্যবসা জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু ক্রমশ ওর সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়ে গেল। এর মধ্যে যেটুকু ব্‌ঝেছি বব-এর পেটে বেশি বিদ্যে ঢোকে নি। একজন কর্মঠ অশিক্ষিত য্‌বক হিসেবে তার মতো মান্‌ষ প্‌থিবীর সব দেশেই আছে। ববকে বললাম, 'ভারতীয় দেখলেই তোমরা যদি তাকে এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ কর তাহলে তো খ্‌ব ম্‌শকিল।'

বব বলল, 'সবাইকে তো করি না। মাসখানেক আগে একজনকে করেছিলাম সে আসলে পাকিস্তানি।'

বললাম, 'এরকম কাণ্ড করে যে একবার ব্র্যাকপ্‌ল থেকে চলে যায় সে কেন আবার এখানে ফিরে আসার ঝ্‌ঁকি নেবে?'

বব বলল, 'তা অবশ্য। কিন্তু বলা তো যায় না, যদি ফিরে আসে।'

ব্র্যাকপ্‌লে সারা বছর কার্নিভাল লেগেই আছে। ডানদিকে পরপর জ্‌য়ো খেলার দোকান। এদেরই একটা মিনি সংস্করণ দেখেছিলাম বোস্টনের ক্যাসিনোতে। ইতিমধ্যে হ্যাণ্ডেল টেনে তিন তাস মেলাতে দ্‌ পাউণ্ড হেরে বসে আছি। পর পর বেটিং সেণ্টার চলে গেছে রাস্তা ধরে। প্‌তুল ঘোড়ার রেস যে বোর্ডে হচ্ছে তার আয়তন একটা ব্যাডমিণ্টন কোর্টের মতো। আজ রবিবার বলেই ভিড় নেই।

আমার এইসব দেখার আগ্রহ ববের ভালো লাগছিল না। সে বলল, 'চল, ট্রামে চেপে ওপাশে যাই।' আপত্তি করলাম না। যদিও কিন্তু দু-পাউণ্ডের জন্যে মন খচখচ করছিল। ট্রামে উঠে টিকিট কাটতেই এক পাউণ্ড বেরিয়ে গেল। তবু কলকাতার রাস্তায় যখন নতুন ট্রাম বের হয় তখন তার অবস্থা প্রথমদিনে এইরকমই থাকে। জানলার পাশে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে চললাম। এর মধ্যে কেউ কেউ পাল-তোলা নৌকো নিয়ে একলা বেরিয়ে পড়েছে। জলের বুকে তাদের রঙিন নৌকো চমৎকার দেখাচ্ছে। সমুদ্রের গা ঘেঁষেই ট্রাম চলে। ক্রমশ আমরা দোকানপাট-মেলা চত্বর ছাড়িয়ে এলাম। এবার বব বলল, 'চল, নেমে পড়ি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি দেখার আছে?'

'তেমন কিছু নেই। হয়তো তোমার ভালো লাগবে। না লাগলে ফিরে আসব।'

অতএব নামলাম। ট্রাম চলে গেলে জায়গাটা একদম নির্জন হয়ে গেল। সমুদ্রের ওপর বয়ে যাওয়া বাতাস আর সামনে বড় বড় গাছের সারি। প্রায় অচেনা একটা লোকের সঙ্গে এরকম জায়গায় যেতে পণ্ডিতেরা আপত্তি করবেন কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছিল। রাস্তা পার হয়ে ববের সঙ্গে খানিকটা যেতেই ছোট ছোট বাড়িঘর দেখতে পেলাম জঙ্গলের আড়াল সরলে। অবশ্য অনেক গাছের সমষ্টিকে জঙ্গল বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে যদি সেই গাছগুলোকে পরিকল্পনামাফিক বড় করা হয়।

দেখলেই বোঝা যায় বাড়িঘরগুলো স্বল্পবিত্ত মানুষদের। অনেক ছোট ছোট নৌকো উলটে রাখা আছে। মাছের আঁশটে গন্ধ নাকে এলো। কেউ কেউ নৌকো সারাচ্ছে, রঙ করছে। আমাদের দিকে মুখ তুলেও তাকাল না। বব জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ার খাবে?' এর আগে পাল একই প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমি না বলেছিলাম। কিন্তু এখন এই

আঁশটে গন্ধের মাছমারাদের ডেরায় ঢুকে মনে হলো আকাশে রোদ না থাকলেও খাওয়া যেতে পারে।

মদের ব্যাপারে আমার গুরুদেব রামচন্দ্রদা বলেছিলেন, 'যারা বলে এই সময়ে ওটা খেতে হয় ওই সময়ে এটা, তাদের মতো মূর্খ পৃথিবীতে নেই। যার যেমন খেতে ইচ্ছে করে সে তখন খাবে। কথায় বলে আপরুচি খানা। কেউ কেউ তো চারবেলা ভাত খায়, খায় না? দুপুরে বিয়ার খাবো, সন্ধের পর খাবো না, একি কথা? আমার যদি হুইস্কি রাম ভদকা জিন খেতে খারাপ লাগে তাহলে সন্ধে হয়ে গেলেই পছন্দসই বিয়ার খাবো না? এগুলো তোদের শিখিয়েছেন সাহেবরা যাতে সব ব্রান্ডের মদ বিক্রি হয়। তা ওরা তো জল না মিশিয়ে কাঁচা মদ খায়। অত যদি নিয়ম মানো খাওনা বাঙালি কাঁচা মদ।'

রামচন্দ্রদার মতো অভিজ্ঞতা মদের ব্যাপারে আমার নেই। কিন্তু বিদেশে এসে একটা তফাৎ খুব লক্ষ্য করছি। কলকাতায় বন্ধুরা যখন মদ্যপান করতে বসেন তখন বাদাম পাঁপরভাজা জাতীয় কিছু থাকেই চাঁট হিসেবে। জারে থাকে জল। এদেশে কাউকে ওসব সাজিয়ে নিয়ে মদ খেতে দেখিনি। বরফের টুকরো নেওয়া চলতে পারে। মনে পড়ছে একবার আমরা দার্জিলিং-এ ছিলাম। বরেন গাঙ্গুলী, অভ্র রায় ছাড়া খগেনদা নামের একটি সরল মানুষ সঙ্গে ছিলেন। সমরেশ বসু সেই সময় দার্জিলিং-এ। তিনি আগের রাত্রে আমাদের খুব খাইয়েছেন। ফলে আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম পরের সন্ধ্যায় একত্রে পান করতে। খগেনদার ওপর ঘরদোর ঠিক করে রাখার দায়িত্ব দিয়ে আমরা তিনজন দুপুরে বেরিয়েছিলাম। ফেরার সময় সমরেশদাকে নিয়ে ফিরলাম। খগেনদা দরজা খুলে সমরেশদাকে দেখে প্রায় নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আপনি এসেছেন আমি ধন্য। এঁরা আমার ওপর ভার দিয়েছেন ব্যবস্থা করার জন্যে। কিন্তু বিদেশ বিভুঁইতে সব কিছু পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবু—।' তিনি নবাব-

দের যেমন দুহাত নেড়ে আপ্যায়ন করা হয় সেইভাবে সমরেশদাকে টেবিলে নিয়ে গেলেন। টেবিল দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। টেবিল-ক্লথের অভাবে নিজের গামছা পেতেছেন খগেনদা। তার ওপর দু'দুটো হুইস্কির বোতল। পাশে ভাঁড়ের মধ্যে কাবুলি ছোলা ভেজানো। আর একটি ভাঁড়ে ছাড়ানো বাদাম। গ্লাসগুলো গায়ে গায়ে রাখা। সমরেশদা অট্টহাস্য হাসলেন। আমাদের লজ্জা বাড়ল। খগেনদা থতমত হয়ে বললেন, 'কোনো ত্রুটি হলো? ছোলাবাদাম দিয়েই তো মদ খায়। তার ওপর জল ঢালার পরিশ্রম বাঁচাতে আমি এক বোতলের মদ দু'বোতলে ঢেলে আগেই জল মিশিয়ে রেখেছি।'

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সম্মতি জানাতেই বব আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। যাওয়ার পথে কর্মরত মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল ডেকে ডেকে। বব জানাল এটা জেলেদের আস্তানা। সামনের সমুদ্রে মাছ ধরে এরা। বেশিরভাগেরই মাছ ধরার লঞ্চ আছে। তবে নৌকোও ব্যবহার করে কাছেপিঠে।

একটি গ্রাম্য পাবে আমরা ঢুকলাম। আধা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে আঁশটে গন্ধ পাবের ভেতর ঝুলছে। কাউন্টারের পেছনে পাকা ঝোলা গোঁফ নিয়ে এক রোগাটে বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিল। ববকে দেখামাত্র বলল, 'হেলো বব। জুলিকে আমার অভিনন্দন। শুনলাম ওর ছেলে হয়েছে।' বব বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ জো। দুটো বিয়ার দাও।'

দেখলাম এই অবেলাতেও পাবের প্রতিটি টেবিল ভর্তি। পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। পেছনের দেওয়ালে টিভি চলছে। বিয়ারে চুমুক দিয়ে বুঝতে পারলাম এখানকার সবাই যে মদ্যপান করছে তা নয়। অনেকের হাতেই কফির কাপ। ওপাশে একজন প্রবীণা মহিলা প্রায় মাতাল হয়ে গান করছেন। তাঁকে ঘিরে অনেকেই হৈহৈ করছে। জো বলল, 'তোমার মা নাতি হবার আনন্দে সেলিব্রেট করছে।' বব বিয়ারের জাগ কাউন্টারে রেখে এগিয়ে গেল ভিড়টার উদ্দেশ্যে।

দেখলাম সে ওই প্রবীণার কানে কানে কিছু বলল। প্রবীণা গান থামিয়ে চট করে মুখ ফিরিয়ে কাউণ্টারের দিকে তাকালেন। বব তাঁকে আবার কিছু বলতেই তিনি টলোমলো পায়ে আসতে লাগলেন আমার দিকে। প্রবীণা উঠে আসায় জমায়েতের ছন্দপতন হলো। তারাও আমাকে নিজেদের চেয়ারে বসে লক্ষ্য করতে লাগল।

প্রবীণা আমার সামনে এসে সেকেণ্ড তিরিশেক দাঁড়িয়ে রইলেন মুখের দিকে চেয়ে। অবশ্য সোজা স্থির হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রবীণা শেষ পর্যন্ত কথা বললেন, 'আই অ্যাম সরি। আমার ছেলে তোমাকে হ্যারাস করেছে বলে আমি দুঃখিত।'

বললাম, 'ওটা আমি এতক্ষণে ভুলে গিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।' প্রবীণার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'তোমরা, ছেলেরা, দেখেছি তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পার কিন্তু আমরা মেয়েরা কিছুতেই পারিনা।'

কি বলব বুঝতে পারছি না। অবশ্যই কথাগুলোর মধ্যে যে ব্যথা মিশে আছে তাতে সদ্যপ্রসবা কন্যার ভাবনা মাখামাখি। হঠাৎ প্রবীণা বললেন, 'আমার নাতি হয়েছে। খুব আনন্দের দিন এটা। তুমি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে? আমি সেলিব্রেট করছি।'

অনেক রাত্রে আমরা বোস্টনে ফিরে এলাম। রাত এবং রবিবার বলেই রাস্তায় কোনো মানুষ নেই। ঠাণ্ডাও বেড়েছে তিনগুণ। কয়েক পাত্র বিয়ার খেয়েও শরীরে তেমন প্রতিক্রিয়া হয় নি। পালকে ফেরার পথে সবই বলেছি। ও শুধু বলেছে, 'আপনি ভাগ্যবান, অচেনা জায়গায় বিপদে পড়তে পারতেন।' কিন্তু আমার সে কথা একবারও মনে হয় নি!

একটা বিকেল এবং প্রায় সন্ধ্যা আনন্দিতা দিদিমার সঙ্গে কাটিয়ে মনে হচ্ছিল একজন ভারতীয়ের করা অন্যায়ের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম। কানে বাজছিল চলে আসার মুহূর্তে প্রায় মাতাল প্রবীণা বলেছিলেন, 'গুডবাই মাই সন। আই অ্যাম হ্যাপি, বিকজ আই অ্যাম সেলিব্রেটিং মাই গ্রাণ্ডসন্স বার্থ উইথ ইউ, এন ইণ্ডিয়ান।'



৯

লণ্ডনে একটা থাকার জায়গা দরকার। কলকাতার অধিকাংশ বাঙালির অবশ্য সেখানে থাকার সমস্যা খুব বেশি হয় না। কারণ কোনো না কোনো পরিবারের সূত্রে লণ্ডনের বাঙালিকে পাকড়াও করা যায়। তিনি মনে মনে না চাইলেও দিনকয়েক তাঁর বাড়িতে থাকতে অসুবিধে নেই। এই প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোকের কথা জেনেছি। লেখক শৈবাল মিত্র আমায় বলেছিল, 'লণ্ডনে যাচ্ছিস সুভাষের ওখানে উঠিস, চিঠি দিয়ে দেবো।' কিছুদিন বাদে অভিনেতা ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, যার সঙ্গে শৈবালের যোগাযোগ নেই, বলেছিল, 'লণ্ডনে যাচ্ছেন সমরেশদা? সুভাষকে লিখে দিচ্ছি, সোজা ওর ওখানে গিয়ে উঠবেন।' সুভাষ গাঙ্গুলীর বাড়িতে ওঠার কথা আমাকে এমন কয়েকজন বলেছেন, যাঁদের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ নেই। তাই মানুষটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল হয়েছিল। নয় নম্বর ওয়াশিংটন ক্রিসেণ্টের বারো তলায় ভদ্রলোকের বাস। টেলিফোন নম্বর আছে। ইচ্ছে হচ্ছে লণ্ডনে গেলে ওঁর ফ্ল্যাটটা একবার দেখে আসার। কিভাবে তিনি এত বঙ্গসন্তানকে

থাকার জায়গা দেন ?

বোস্টন থেকেই পালকে বললাম টেলিফোনে দীপঙ্করকে ধরতে। দীপঙ্কর ঘোষ বি বি সি-র কর্মচারি। কলকাতা বুক ফেয়ারে এসেছেন ওই সংস্থার সঙ্গে। কলকাতায় বাড়ি। এখন স্ত্রী ও দুই কন্যা নিয়ে পাকাপাকি লণ্ডনের বাসিন্দা। দেশ পত্রিকায় লণ্ডনের চিঠি লেখার সুবাদে একটু নৈকট্য হয়েছে। আমার গলা শুনে দীপঙ্কর চমকে গেল। নরওয়ে থেকে লণ্ডনে না এসে বোস্টনে গিয়েছি শুনে আরও অবাক। অনুযোগ করতে লাগল। বললাম, 'লণ্ডনে যাচ্ছি, অল্প পয়সায় একটা থাকার জায়গা দেখুন। দিন পাঁচেক থাকব।'

দীপঙ্কর বলল, 'আপনি সোজা আমার বাড়িতে চলে আসুন।'

আপত্তি করলাম,'সেটা করলে ভালো লাগত কিন্তু সুবিধে হতো না। আমি একা থাকতে চাই, তাতে হাজারটা সুবিধে। আপনি হোটেল বা গেস্ট হাউস নিদেন পক্ষে মেস দেখতে পারেন আমার জন্যে।'

দীপঙ্কর বলল সন্ধ্যের মধ্যে আমাকে নামিয়ে দেবে। অতএব বোস্টনের পালা চুকল আমার। আজ সারাদিন কাটল গড়িমসি করে। শুধু ভিডিও দেখা। এমন কি স্নান পর্যন্ত করলাম না। পাল আমার অনারে কোথা থেকে কাঁঠাল আনিয়েছে। বাঙালি সাহেবদের দেশটাকে আর সাহেবী রাখছে না। স্নানটান না করেই পাল আমাকে জোর করে বের করল একসময়। সে নতুন বাড়ি করেছে। আমাকে দেখাবে। এই রাস্তায় আমি যাইনি। গাড়ি ক্রমশ ওপরে উঠছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। সেইসঙ্গে হাওয়া। তারপর হাওয়াটা বন্ধ হলো। দেখলাম দার্জিলিং-এর মতো কুয়াশায় পথ আটকে ছড়িয়ে। পাল মাইল দুয়েক গাড়ি চালিয়ে যেখানে থামল সেখানে ঠাণ্ডা সম্ভবত জিরো ডিগ্রিতে। গাড়ির আরাম ছেড়ে বেরুতে বাসনা হচ্ছিল না। কিন্তু নিজের বাড়ির ব্যাপারে বাঙালির অদ্ভুত মমতা থাকে। নির্মাণের সময় থেকেই সে পাঁচজনকে ডেকে দেখাতে চায় তার ভালবাসার জিনিসকে। কিছু

মানুষকে এ ব্যাপারে এমন ইনভলভড হতে দেখেছি যে মনে হয়েছে পৃথিবীর সব সম্পর্ক নস্যাৎ করে তিনি তাঁর সমস্ত ভালবাসা বাড়িটিকেই দান করেছেন। সিলেট এবং পরবর্তীকালে আমাদের ছিন্নমূল বঙ্গসন্তান পাল নিজের ক্ষমতায় ইংলণ্ডে জমিয়ে বসেছিল এতদিন। এবার নিজস্ব বাড়ি তৈরি করছে। অতএব সে চাইবেই আমি একবার দেখি।

গাড়ি থেকে নামতেই মনে হলো হাড় নড়ে উঠল। পায়ের আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বরফ ঘষা চলছে। ঘাসের ওপর কুচি কুচি তুষার নামছে। মুখ খুলতেই গরম বাষ্প বের হলো। পালের কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হলো না। গেট খুলে ভেতরে পা দিতে গিয়েই পাল দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এখনও কমপ্লিট হয় নি, বুঝলেন। কিন্তু স্ট্রাকচার দেখে আপনার কেমন মনে হচ্ছে বলুন তো?' বত্রিশ পাটির বাজনা শুনতে শুনতে মাথা নাড়লাম, ভালো। এইসময় পাশের বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, 'গুড আফটারনুন পাল। কাল সারাদিন তোমার বাড়িতে খুব আওয়াজ হয়েছে। আমি অবশ্য কাউকে বের হতে দেখিনি। তাই বলি, তাড়াতাড়ি শেষ করে এখানে চলে এস।'

পাল বলল, 'মিস্ত্রিগুলো ঝোলাচ্ছে নইলে কবেই চলে আসতাম।'

'তোমার উচিত ছিল ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্টরকে দায়িত্ব দেওয়া।'

পাল উত্তর না দিয়ে হেসে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে চাপা গলায় বলল, 'তাহলে আমি ফতুর হয়ে যেতাম।' এসব ব্যাপারে মানুষের চিন্তা দেশকাল ভেদে পৃথক হয় না। দূরদর্শনের প্রাক্তন আঞ্চলিক অধিকর্তা নির্মল শিকদার মশাই আমাকে একই গল্প শুনিয়েছিলেন, সল্টলেকে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল তাঁর। প্রতিদিন ছাতি মাথায় রোদ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি মিস্ত্রিদের কাজকর্ম দেখতেন। স্বভাবতই ওই বয়সে পরিশ্রম কম হতো না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন কাউকে

কণ্ট্রাক্ট দিচ্ছেন না? তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বললেন, 'একটা গল্প বলি শুনুন। ভিৎ পুজো করব। আমার স্ত্রী পুরুতকে ডেকে বললেন যা যা লাগবে তা যোগাড় করে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। ওসব ঝামেলা আপনি পোহাবেন। কত লাগবে বলুন একেবারেই ধরে দিচ্ছি। পুরুতমশাই অনেকক্ষণ হিসেব করে বললেন তিনশ টাকা। স্ত্রী তাতেই রাজি। আমার খটকা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার দক্ষিণা কত? পুরুত বললেন, পঞ্চাশ। যে যে জিনিস লাগবে তার লিস্ট নিয়ে বাজার করে ফিরে এসে দেখলাম নব্বুই টাকা খরচ হয়েছে। আগেই কথা ছিল গল্ফগ্রীন থেকে সল্টলেকে পুরুত আমাদের গাড়িতেই যাবে। অতএব তার এক পয়সা ট্রান্সপোর্ট বাবদ খরচ নেই। তাহলে পুজো বাবদ তিনি মাত্র একশ চল্লিশ ব্যয় করবেন আর চাইলেন তিনশ। আমি হিসেব পেয়ে গেলাম। যে বাড়ি নিজে দাঁড়িয়ে করলে দু'লাখ আশিতে শেষ হবে তা কণ্ট্রাক্টরকে দিলে পড়বে ছ'লাখ। যতই দাঁড়িয়ে থাকি যতই রোদে পুড়ি তার দাম কি তিন লাখ কুড়ি হবে?'

ছবির মতো একটা রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা ফাঁকা সুন্দর বাড়ি। রাস্তাটা ঈষৎ পাহাড়ি। যদিও ইংলন্ডে কোনো পাহাড় নেই তবু অবস্থান অনুযায়ী পাহাড়ি আবহাওয়ায় সারাবছর জুড়ে আছে। পাশের বাড়িতে কাজকর্ম প্রায় শেষ শুধু জানলা দরজা বসেনি, চুনকাম হয় নি। এখানে অবশ্য চুনকাম হয় না। পেইন্টস সেই জায়গা নিয়েছে। ইলেকট্রিকের লাইন বসছে। একতলায় একটা হলঘর, গ্যারেজ, দেড়তলায় কিচেন, দোতলায় যতটা সম্ভব সুবিধে দিয়ে কয়েকটা বেডরুম। হঠাৎ মনে হলো এই বাড়িতে একটা বিছানা পেতে এবং রুমহিটার জ্বালালে থাকা যেত। এবং সেই একা থাকাটা কেমন হতো? সকালে উঠে কাঁপতে কাঁপতে চা বানাতাম, বাজারে যেতাম, লিখতাম, যখন ইচ্ছে খেতাম, অনেক অনেকক্ষণ ঘুমাতাম। পৃথিবীর কোনো নিয়ম-

কানুন মানতে হতো না। কেউ এসে বলত না এটা করতে হবে, ওখানে চল। প্রথম দিন যদি এই বাড়িটাকে দেখতাম তাহলে একটা চেষ্টা করা যেতো। পাল বলল, 'এর পরের বার যখন আসবেন এই বাড়িতে থাকতে পারবেন। এত নির্জনতা নিশ্চয়ই লেখকদের পছন্দ হবে।' সবই ঠিক। কিন্তু তখন তো আমি এ বাড়িতে একা থাকার সুযোগ পাব না।

আর্থার ফ্রমারকে ইউরোপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। কোন শহরের কোথায় কত অল্প পয়সার হোটেল থেকে পাঁচতারা হোটেল পাওয়া যায়, কি কি দেখার আছে, দিনে ও রাতে কি কি পার্থক্য, এক কথায় ইউরোপের নাড়ি নক্ষত্র তাঁর জানা। ভদ্রলোক তাঁর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে যে বইটি লিখেছিলেন তার বর্তমান নাম, 'ইউরোপ, প্রতিদিন পঁচিশ ডলারে।' যতদূর মনে পড়ছে বইটার একসময় নাম ছিল একই, শুধু পঁচিশের বদলে পাঁচ ডলার। সময় এগিয়েছে। জিনিসপত্রের দাম পাঁচ-গুণ বেড়েছে। এবং এই বেড়ে যাওয়াটা ইউরোপে যতটা হয়েছে এশিয়ার দেশগুলোয় ততটা হয় নি। বোস্টন থেকে লণ্ডনে আসার পথে ট্রেনে বসে ফ্রমারের বইটা পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লণ্ডন সম্পর্কে শুরু করেছেন এভাবে, 'লণ্ডন, কারো কারো কাছে, দাগ কাটা শহর, যাকে সম্মান দেখানো যায়, উপভোগ করা যায় না। যখন লণ্ডনের সব কিছু দেখা হয়ে যায় তখন স্মৃতিতে মনুমেণ্ট বা মিউজিয়াম বড় জায়গা নেয় না, বরং ছোট ছোট কিছু দৃশ্য, যেমন কোভেণ্ট গার্ডেনের গ্যালারিতে উপচে পড়া ছাত্রদের ভিড়, রাস্তার এক কোণায় ধোঁয়ায় ভরা শান্ত পাব, কেনিংটোন পার্কে বাচ্চাদের হুল্লোড় অনেককাল মনে পড়ায়। তাছাড়া লণ্ডন হলো ইউরোপের সবচেয়ে দরাজ শহর। যে কোনো বিদেশির এখানে মিশে যেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।' পড়তে পড়তে মনে হলো এসব কথা আমি কলকাতা সম্বন্ধেও বলতে পারি। শুধু শেষ কথাটি ছাড়া। দু'শ বছর সাদা চামড়ার শাসনে

থেকেও বিদেশি আমাদের কাছে বিদেশি। ধর্মতলা পার্ক স্ট্রীটের কিছু দালাল ছাড়া একজন সাধারণ চামড়ার ট্যুরিস্ট দেখে কেউ পুলকিত হই না। বরং সার্পেনটাইন লেনে অথবা হরিঘোষ স্ট্রীটে যদি কোনো সাদা চামড়াকে দেখি,এখনও এই সময়েও,পাড়ার ছেলেরা বেশ কৌতুক অনুভব করি। নিগ্রো হলে কথাই নেই। দিলদরাজ কেউ কেউ এঁদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু আড়ষ্টতার আবরণ এখনও খসেনি।

স্টেশনে নেমে চমকে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটল না। বরং হাওড়া স্টেশনের কথাই মনে হওয়ায় স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারলাম। নতুন জায়গায় স্যুটকেস সঙ্গে থাকলে বাস ট্রামে ওঠা অসম্ভব: অন্তত আমার কাছে। আমেরিকায় ট্যাক্সির ভাড়া চোখ কপালে ওঠার মতো, একবার সেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাওয়ার পর লন্ডনের ট্যাক্সিওয়ালা আর কতটা গলা কাটবে? কিন্তু ট্যাক্সি দেখে মন জুড়িয়ে গেল। লম্বা, অনেকটা জায়গার পুরোনো আমলের গাড়ি। ড্রাইভার গম্ভীর মুখে জানতে চাইল, কোথায় যাব। কোনরকম আড়ষ্টতা না দেখানোর জন্যে গ্রেগরি পেকের গলায় বললাম, 'স্ট্র্যান্ড!' লোকটা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর চটপট একটা কলম আর ছোট প্যাড আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে বানানটা লিখবেন?' প্রায় গালে চড় খাওয়ার মতো অবস্থা। আমি এতো কায়দা করে শব্দটা বললাম আর লোকটা বুঝতেই পারল না। মুখ চোখ লাল করে বানানটা লিখে দিতেই লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল, 'ওঃ, স্ট্রান্ড!' ও যখন ইঞ্জিন চালু করল তখন মনে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করি আমি কি ভুল বলেছি? একটা য-ফলা, সেটা দেওয়া দরকার, সুধাময়বাবু স্কুলে শিখিয়েছিলেন। এ-র উচ্চারণ এ্যা হয়। গাড়ি চলছে লন্ডনের রাস্তা দিয়ে। আমার চোখ ম্যাপের দিকে। এখন আমি বাড়িঘর দেখব না। লোকটা আমায় ঠকায় কিনা সেটা দেখতে হবে। এক মিনিটের পথ দশ মিনিট করতে

তো এদের জুড়ি নেই। রাস্তাটার নাম কিংসওয়ে, তাতো দেখতেই পাচ্ছি একদম সোজা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে নিল। ম্যাপ যদি ঠিক হয় তাহলে এই জায়গাটার নাম অলউইর হওয়া উচিত। ওই তো স্ট্র্যান্ড রোড দেখতে পাচ্ছি। দীপঙ্কর বলেছিল এইখানেই বি বি সির বিশাল অফিস। দূর থেকে স্ট্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনালের সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ড চোখে পড়তেই ট্যাক্সি থামালাম। মোট তিন পাউন্ড দিতে হবে আমাকে। বেশি না কম বুঝতে পারছি না। তিন টাকা ভাবলে লোকটা আমাকে মোটেই ঠকায়নি। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় পাউন্ডকে পরিবর্তন করলে ওই টাকায় শ্যামবাজার থেকে যাদবপুর যাওয়া আসা করা যেত।

ফুটপাতে এক বৃদ্ধ ভিখিরি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে। দোকানপাটগুলো ঝকঝকে। দুটো দোকানের মাঝখানের ফাঁক থেকেই সরু সিঁড়ি ওপরে উঠে গিয়েছে। দীপঙ্কর বলেছিল সাংবাদিক তারাপদ বসু এই হোটেলটি করেছিলেন। তখন নাম ছিল ইন্ডিয়া ক্লাব। ভারতের পরলোকগত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেননজীও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দোতলায় উঠতেই অফিস দেখতে পেলাম। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। কাছে গিয়ে বললাম, 'আমার একটা ঘর চাই।' তিনি মাথা নাড়লেন, 'সরি। আমাদের সব ঘর ভর্তি।'

'কিন্তু আমাকে জানানো হয়েছে যে একটা ঘর আজ থেকে বুক করা হয়েছে।'

'কে করেছেন?'

'বি বি সি-র দীপঙ্কর ঘোষ।'

'ও হ্যাঁ।' ভদ্রলোক দুটো চাবি এগিয়ে দিলেন। একটা আমার ঘরের অন্যটি সদর দরজার। স্নান করতে হবে কমন বাথে। আমার ঘর চারতলায়। দিতে হবে প্রত্যহ এগার পাউন্ড। এই হোটেলে একটা রেস্টুরেণ্ট আছে তিনতলায়। সেটা খাবার সার্ভ করে সময় মেপে। আমাকে

ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে এগার পাউণ্ডের মধ্যেই। শুধু খেতে নামতে হবে সকাল দশটার ভেতরে। এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতেই। একবার মনে হচ্ছিল লোকটি পাঞ্জাবি, পরক্ষণেই ভাবছিলাম সিন্ধি হতে পারেন। ভারতীয় দেখে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নেই। স্যুটকেস টেনে টেনে চারতলায় উঠলাম। ঝকঝকে প্যাসেজ। নিজের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে চোখ জুড়িয়ে গেল। ঘরটি সুন্দর, বিছানা পরিষ্কার। জানলা খুলে দিতেই ওয়েলিংটন লাঙকাস্টার প্লেস ও স্ট্র্যান্ড রোডের মোড় দেখতে পেলাম। বাঃ। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম তারপর।

অতএব আমি এখন লণ্ডনে, একা হোটেলের বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে আছি। ঘরের দেওয়ালে কোনো দাগ নেই,ছাদ নিষ্কলঙ্ক। হঠাৎ মনে হলো আমি হাসপাতালে একা। এ জীবনে এখনও আমায় হাস-পাতালে যেতে হয় নি। কিন্তু এখন ক্রমশ একাকীত্বের অসুখে আক্রান্ত হলাম। ব্যাপারটা একসময় অসহ্য হয়ে পড়ায় লাফিয়ে নামলাম বিছানা থেকে। এইসময় দরজায় শব্দ হলো। কয়েক পা হেঁটে সেটাকে খুলতেই দেখতে পেলাম এক মধ্যবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, 'এক্স-কিউজ মি, আপনার ঘরে কি ডাবল কম্বল দেওয়া আছে?'

মুখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে জানালাম আছে। ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে চলে গেলেন জুতোর শব্দ তুলে। ভারতীয় মহিলার মুখে পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণ। হাঁটাচলায় স্মার্টনেস। পরনে সালোয়ার কুর্তার ওপরে একটা ছোট শাল। পরে জেনেছি এই হোটেলটি পরিচালনা করেন যে লোকটি ইনি তার বড় বউ। কাউণ্টারে বসে থাকা ভদ্র-লোকের স্ত্রী।

দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলাম। এখন ভর বিকেল। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দু'পাশে তাকালাম। সিগারেট কেনা দরকার। ভারতবর্ষের মতো পান সিগারেটের ছোট দোকান বিলেতে নেই। অতএব বাঁ দিকের রকমারি দোকানে ঢুকে পড়লাম। দোকানটি বিশাল

এবং ভারতীয়ের। সিগারেটের প্যাকেটের দাম বোস্টন থেকে বিশ পেনি বেশি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেলসম্যান মাথা নাড়ল, 'আমরা ওই দামেই বিক্রি করি।' অতএব নিতে হলো। পরখ করে দেখলাম অন্যান্য জিনিসের দামও একটু বাজার ছাড়া। অবশ্য সেই বাজারটা আমার জানা মফস্বল শহর বোস্টনের। সিগারেট ধরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই ডাক পেলাম, 'এই যে স্যার!'

দেখলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা সেই বৃদ্ধ সাহেব ভিখিরি আমায় ইশারা করছে। কাছে যেতেই বলল, 'নেশা মানুষ একা করে না। আমাকেও একটা দাও।'

লোকটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে। মাথার ওপর একটা ব্যালকনির আড়াল আছে বটে কিন্তু তিনপাশ খোলা। লালমুখো এত বয়সী ভিখিরি আমি আগে দেখিনি। কলকাতার রাস্তায় ভিখিরিরা সিগারেট চায় বটে কিন্তু কখনই দিইনি। আর এ তো বিলিতি সিগারেট! কিন্তু কৌতূহল হলো, জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখানেই থাক?'

'দশ বছর আছি। পুলিশ জানে, হোটেলওয়ালাও জানে, আমি এখানে বসে চারপাশে নজর রাখি। শুধু শীত বাড়লে বিপদ হয় বরফের জন্যে।' বৃদ্ধ হাসল।

একটা সিগারেট দিলাম। কথা বলতে ভালো লাগছে। লোকটার কাছে দেখলাম লাইটার আছে। ধরাল। ইংরেজি ভাষার সুবিধে হলো আপনি তুমির ঝামেলাতে পড়তে হয় না।

'কিন্তু এখানে তো রাত্রে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অসুবিধে হয় না?'

'এ আর কি এমন ঠাণ্ডা। কম্বল মুড়ি দিলে টের পাই না।' সিগারেটে টান দিয়ে বৃদ্ধ এবার জিজ্ঞাসা করল, 'শহরে এর আগে কোনো দিন আসা হয়েছে?'

'না। আজই প্রথম দিন।'

‘খুব সাবধানে চলাফেরা করো। চোর জোচ্চরে লন্ডনটা ছেয়ে গিয়েছে। তুমি কোন্ দেশের? ভারতীয় না পাকিস্তানি?’

‘ভারতীয়।’

‘আ। পকেটে বেশি পাউন্ড নিয়ে হাঁটবে না। সোহোর দিকে যাবে তবে কোথাও ঢুকবে না। আজকাল হাঁটতে আমার খুব কষ্ট হয় নইলে তোমায় গাইড করতাম।’

‘বি বি সি-র অফিসটা কোন্ দিকে?’

‘ডান দিকে এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে উল্টো ফুটপাতে গেলেই পাবে। আর বাঁদিকে একটু এগিয়ে দেখবে টেমস নদীকে। যাও, ওদিকটা দেখে এসো।’

লোকটা কথা বলছিল গার্জেনের ভঙ্গিতে। ভালো লাগছিল। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগোলাম। ওয়েলিংটন ল্যাঙ্কাস্টার প্লেস ধরে যাওয়ার সময় দেখলাম বন্যার মতো গাড়ি আসছে যাচ্ছে। অথচ একটা হর্ন বাজছে না, ডিজেলের ধোঁয়া বের হচ্ছে না। ঠান্ডা লাগছে। দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছিলাম। এবং তখনই নদীটাকে দেখতে পেলাম। চওড়ায় আমাদের গঙ্গার তুলনায় কিছুই নয়। ব্রিজটার নাম ওয়াটারলু। নিজেদের কীর্তির কথা স্মরণ করার জন্যেই কি নাম-করণ? ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে সেই অপরাহ্নে নদীর দিকে তাকিয়ে অনেকগুলো কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল। সেই টেমস নদী! নদীতে এখন জল পুলিশের লঞ্চ। স্রোতের টান বড় অল্প। কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হলো। নির্জনতা এবং নৈঃশব্দ্য যাদের প্রিয় তাদেরও কখনও কখনও একটা সময় আসে যখন কথা বললে ভালো লাগে। উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলাম। বি বি সি-র রিসেপশনে পাহারাদারি বড় কড়া। ইউনিফর্ম পরা কিছু স্বাস্থ্যবান মানুষ সতর্ক চোখে আগন্তুককে দেখে যায়। রিসেপশনিস্ট টেলিফোনে দীপঙ্করকে খবর পাঠাল। আরও দু’জন আমার মতো অপেক্ষায় বসে।

ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই। ওই মুহূর্তে আমার ম্যাগাজিন দেখার কথা ছিল না, প্রয়োজনও নেই। তবু কত কি না আমরা অকারণে করে থাকি। দীপঙ্কর এল। পাকা চুল অল্প বয়সেই তাকে দীপ্তি দিয়েছে। এক গাল হেসে হাত বাড়াল। তারপর আমার জামিনদার বলে নিজেকে ঘোষণা করলে ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। বুকে একটা ব্যাচ মেরে দেওয়া হলো আমার।

সমস্ত পৃথিবীতে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন তাদের প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে এই বাড়ি থেকেই। ভাবতে অবাক লাগে তারা ভারতবর্ষের জন্যেই কয়েক ভাষার আলাদা কর্মচারি রেখেছে। দীপঙ্কর সিরাজুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। বাংলাদেশী এই ভদ্রলোক বাংলা বিভাগের প্রধানকর্তা। খুব জমাটি মানুষ। নিজেরও নাটক লেখার অভ্যেস আছে। বললেন, 'এখন তো কাজকর্ম শেষ। চলুন ক্যান্টিনে গিয়ে আড্ডা মারি। দীপঙ্কর, তুমিও ডেস্ক গুছিয়ে চলে এস।' কর্তাব্যক্তিদের এরকম কথাবার্তা বলতে শুনিনি আগে। ক্যান্টিন বলতে এতকাল যে ধারণা ছিল বি বি সি-র ক্লাবরুমে ঢুকে সেটা হোঁচট খেল। যে কোনো বড় বার কাম রেস্টুরেন্টের চেয়ে কিছু কম নয়। উর্দি পরা কর্মচারিরা কাউন্টারের ওপাশে। তবে যা চাই নিজে নিয়ে আসতে হবে সেখান থেকে। টেবিলগুলো জমজমাট। সিরাজুরকে দেখে অনেকেই হাত নাড়লেন। পছন্দসই টেবিল বেছে নিয়ে সিরাজুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন, ভদকা না হুইস্কি?' এখানে সম্ভবত কেউ চা কফি জিজ্ঞাসা করে না। ভদকা আর টনিক দিতে বললাম। বেঁটে খাটো মানুষটি তরতরিয়ে চলে গেলেন। চারপাশে যাঁরা আড্ডা মারছেন তাদের একটা আন্তর্জাতিক চেহারা আছে। বৃটিশ তো আছেই, আফ্রিকান, জাপানি, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মানুষদেরও দেখতে পাচ্ছি। সম্ভবত সহকর্মী বলেই আড্ডাটা খোলামেলা। সিরাজুর সেই ভুলটা ভাঙালেন। বললেন, 'এক

একটা টেবিলে এক একটা ভাষাকে কেন্দ্র করে আড্ডা জমছে। মাঝে মধ্যে আমার মতো দল ছুটরা এ টেবিল ও টেবিলে লাট্টুর মতো ঘোরে। 'কোথায় উঠেছেন?'

'স্ট্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল।'

'ও ইন্ডিয়া ক্লাব! ভালো, পিসফুলি থাকতে পারবেন। নিন।' নিজের গ্লাসটা তুলে ধরে হেসে বললেন, 'আনন্দ।'

মদের আসরে যে কোনো বাঙালিকে আমরা 'চিয়ার্স' বলতে শুনি। সিরাজুর সম্পর্কে আমি অবিলম্বে আকৃষ্ট হলাম। স্যুট পরে থাকা সত্ত্বেও ইনি পুরোপুরি বাঙালি। দীর্ঘদিন বি বি সি-র সঙ্গে জড়িত। ওঁর মুখে পাকিস্তানি আমলের বাংলাদেশের নানান ঘটনা শুনেছিলাম। এই সময়ে শংকরলাল ভট্টাচার্য আর মানসী বড়ুয়া এল। আনন্দবাজারের শংকরলালকে এখানে দেখে আমি অবাক। হেসে বলল সানন্দার কাজ নিয়ে এসেছে। লন্ডন সম্পর্কে শংকরলাল একজন বিশেষজ্ঞ। এই শহরের জীবনযাত্রার নাড়িনক্ষত্র জানে। শংকরলাল বলল, 'খেতে হলে এই ক্লাবে চলে আসবেন। সস্তায় এত ভালো খাবার কোথাও পাওয়া যায় না। আর মানসীর মতো কেউ থাকলে দামটা দিতে হবে না, সেটা পুরো লাভ।'

মানসী সুন্দরী। কলকাতার মেয়ে। ছড়ায় ভালো হাত আছে। খবরটা পঙ্কজ সাহা বলল। ইনি সেই পংকজ যিনি কলকাতার দূরদর্শনে দর্শকের দরবারে পরিচালনা করতেন। এখন বি বি সি-তে চাকরি করছেন। একটু বাদে পংকজ এসে জমিয়ে তুলল আড্ডা। পংকজকে দেখলাম একইরকম আছে। শুধু শরীরের আবরণ শীতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কিছুটা বদল হয়েছে। কিন্তু একমুখ দাড়ি নিয়ে কথা বলার সেই কায়দাটা ঠিকঠাকই রয়েছে। অর্থাৎ সিরাজুর রহমানের বাংলা বিভাগের সংসারটি বেশ চমৎকার। নানান মজার গল্প হচ্ছিল। দীপংকর বলল, 'জানেন মিসেস গান্ধী খুন হবার এক ঘণ্টার মধ্যে

আমরা খবরটা প্রচার করেছিলাম। অথচ আকাশবাণী অনেক সময় নিয়েছিল। কলকাতার মানুষ প্রথমে বি বি সি থেকেই ঘটনাটা জানতে পারে।' যে ব্যাপারটা আমাকে মুগ্ধ করল সেটা নিয়ে কলকাতায় এক-সময় আমরা অনেক ভেবেছি। কাজ হয়েছে অত্যন্ত সামান্য। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলার মানুষের লেখার ভাষা এক। গল্প, কবিতা, উপন্যাসে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ দুই বাংলার সাহিত্যকেই রক্ত যোগাচ্ছেন। অথচ ওপার বাংলার লেখকদের লেখা আমরা পড়ি না। কোনো পশ্চিমবঙ্গীয় পাঠককে যদি দু'জন বাংলা-দেশী ঔপন্যাসিকের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। এদেশের কাগজে এবং কয়েকজন প্রকাশক সামসুর রহ-মান বা সামসুল হক বা জিয়া হায়দারের কবিতা ছেপেছে বলে অনেকে এঁদের নাম জানেন। কিন্তু গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে একদম অন্ধকার। অথচ কনিষ্ঠতম পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকের লেখার কথা ঢাকার সাহিত্য-রসিকরা জানেন। বাংলাদেশের পাঠকরা তাঁদের মতামত চিঠিতে জানান। ঢাকায় আমাদের গল্প উপন্যাস তিনগুণ দামে বিক্রি হয়। এদেশের পত্রপত্রিকার চাহিদা ওদেশে প্রচুর। বই-এর ব্যাপারে সরকারি বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ার পর এদেশ থেকেই বই যাচ্ছে বেশি। কিন্তু কেন এই একতরফা ব্যাপার? এখন বাংলাদেশে যা লেখালেখি হচ্ছে তার মান আমাদের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। বরং আন্তরিক সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা রয়েছে ওঁদের লেখায়। ওঁদের বইপত্র বাংলা-দেশী পাঠকেরাও সাগ্রহে কেনেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় বাংলা-দেশী লেখকদের বই-এর বিরাট মেলা হয়। তাহলে? আমার ধারণা এর অন্যতম কারণ অনভ্যাস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে একমাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি ছাড়া আর কোনো গদ্য লেখক চূড়ান্ত সফল হয় নি। নজরুল ইসলাম বা জসিমউদ্দিন গদ্য লিখতেন না। মুজতবা আলি সাহেবের লেখা পড়ে মনেই হতো না তিনি আমাদের

অচেনা মানুষ। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছাড়া তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা এবং বিচিত্র চরিত্রচিত্রণ পাঠকদের আগ্রহ আকাশছোঁয়া করেছিল। ওঁর পরে সৈয়দ মুজতবা সিরাজকে পশ্চিম-বঙ্গীয় পাঠক নিয়েছে কারণ সিরাজের লেখায় হিন্দু মুসলমান জড়িয়ে ছিল। কিন্তু মুজতবা আলির মতো সাফল্য সিরাজ পাননি। হিন্দু পাঠক নানান কারণে প্রতিবেশী মুসলমানের জীবনযাত্রা সম্পর্কে উদাসীন ছিল এতকাল। ফলে মুসলমানদের জীবনভিত্তিক উপন্যাসকে সাবলীলভাবে গ্রহণ করতে কোথায় যেন আড়ষ্টতা লেগেই থাকত। গৌরকিশোর ঘোষ মুসলমানদের জীবন নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় দারুণ একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, 'প্রেম নেই।' সেটিকে পাঠকরা দেশ পত্রিকায় পড়ে প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু আলাদাভাবে বই কত বিক্রি হয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান পাঠকেরা সংখ্যায় অল্প। সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁদের জাতিভেদের উন্নাসিকতা নেই, ধর্ম সক্রিয় ভূমিকা নেয় না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের লেখাতেই তাঁরা অভ্যস্ত, ফলে বাংলাভাষায় এপারে মুসলমান চরিত্র নিয়ে লেখালেখির চল নেই বললেই হয়। বাংলাদেশী এক মহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'সাহিত্যের আবার হিন্দু-মুসলমানত্ব কিছু আছে নাকি। সাহিত্য মানে মানুষের কথা। মুসলমানদের কেউ যদি তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়েই লেখালেখি করতে থাকেন তাহলে তাঁকে সরকারি কোটায় একটা জায়গা দেওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আয়ু বেলুনের মতো। মুজতবা আলি সেটা বুঝেছিলেন বলেই তাঁর মানসিকতা ব্যাপক করে নিজেকে এসবের ঊর্ধ্বে তুলে নিতে পেরেছিলেন।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখকরা যে শুধু তাঁদের নিয়েই লিখে যাচ্ছেন অথচ আয়ু কমছে না, সে ব্যাপারে বক্তব্য কি?' মুসলমান মহিলা বলেছিলেন, 'বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন

কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে সেকথা মাথায় আসে নি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র আমাদের পাঠের অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছেন। সেই অভ্যাসেই যখন আপনাদের লেখা পড়ি তখন কিছুতেই আটকায় না। শুধু ভাবি লেখাটা সাহিত্য হয়েছে কিনা। তা, অন্তত এই সাহিত্যে পাঠক হিসেবে আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক।'

বি বি সি এই দুই বাংলার সাহিত্যকে একত্রিত করতে পেরেছেন। যাঁরা নিয়মিত বি বি সি শোনেন তাঁদের কাছে সুনীল গাঙ্গুলী আর সামসুর রহমানকে একই সংসারের মানুষ বলে মনে হবে। এবং এই-টেই কাম্য।

আড্ডাতেই খবর পেলাম অমিতাভ চৌধুরী সস্ত্রীক লন্ডনে এসেছেন। লণ্ডনকে এখন আর আমার বিদেশ বলে মনে হচ্ছে না। মানসী আমাদের নেমন্তন্ন করলেন ওঁর বাড়িতে আগামীকাল রাত্রে খাওয়ার জন্যে। ঠিক হলো বিকেলে বি বি সি-তে আসব এবং পঙ্কজ আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে। তার পরের সন্ধ্যায় দীপঙ্করের বাড়িতে তাবৎ বাঙালিদের খাওয়া দাওয়া। শঙ্করলাল আমায় বলল,'এইটেই সুবিধে। এত নেমন্তন্ন পাওয়া যায় যে আর পকেটে হাত দিতে হয় না।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হলো কাগজটা দেখলে হয়। জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম উল্টো ফুটপাতে একটা স্টলে কাগজ বিক্রি হচ্ছে। পরিষ্কার হয়ে নিচে নামলাম। এখনও হোটেলের খাবার ঘরের দরজা খোলেনি। অথচ এক কাপ চা খাওয়া দরকার। নিচে নামতেই দেখলাম বৃদ্ধ ভিখিরি সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চায়ের দোকান কোথায় আছে?'

বৃদ্ধ বলল, 'আধ ঘণ্টা পরে খেলে তো হোটেলে বিনি পয়সায় পাবে। ফালতু ষাট পেনি খরচ করতে যাচ্ছ কেন?' চমকে গেলাম। মানুষটিকে ভিখিরি ভাবতে এবার লজ্জা করল। ষাট পেনি মানে বারোটা টাকা। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা যায়। কাগজের স্টল থেকে এক পত্রিকা কিনে

ঘরে ফিরে এলাম। পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়ল, 'এপসন ডার্বি'।' এপসন নামক কোনো একটি জায়গায় রেসকোর্স আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বাজি এপসন ডার্বি'র রেস আজ সেখানে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনের মুখ মনে পড়ে গেল। পড়াশুনা করে বোস্টনে বসে সে আমাকে বলেছিল সিওর চ্যাম্পিয়ন নামের একটি ঘোড়া ডার্বি জিতবে। লণ্ডনের প্রথম দুপুরে রেসকোর্সে ডার্বি দেখতে যাব বলে ঠিক করলাম।





১০

কলকাতার রেসের মাঠে গিয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যাঁরা নিজস্ব কিছু তত্ত্ব তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে-সব যে সব সময় মেলে তা ভাবার কারণ নেই। মিললে তো তাঁরা এতদিনে টাটা-বিড়লাকে ছাড়িয়ে যেতেন। যখন মেলে না তখন পাল্টা একটা কারণ ঠিক বেরিয়ে যায়। এরকম একটা তত্ত্ব হলো,যখন কোনো ঘোড়া জিততে আরম্ভ করে তখন সে না হারা পর্যন্ত তার ওপর বাজি ধর। চলতি ফর্ম সব অঙ্কের হিসেব গোলমাল করে দিতে পারে। রামচন্দ্রদা বলেছিলেন, জীবনের ক্ষেত্রেও তাই একই ব্যাপার। যার ওঠার পালা শুরু হয় তাকে আটকানো খুব মুশকিল। সিনসিয়ারিটি এবং এফর্ট থাকলে সে আরও ওপরে উঠবেই তা তুমি যতই বাধা দাও। ঘোড়ার রেসে এসে আমি জীবনের দর্শন খুঁজে পাই।

ঠিক এই ধরনের মানুষজনের সন্ধান আমি বোম্বাই-এর মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে পাইনি। নিউইয়র্কে মনোজের সঙ্গে রেসকোর্সে গিয়েও দেখেছি কিছু লোক উদাসী আলাপ করছে। হয়তো সেখানে আমি

বাইরের মানুষ বলেই ভেতরে ঢুকতে পারিনি। তবে ভারতবর্ষে রেস নিয়ে গিয়েছিল সাহেবরা তাদের বিনোদনের জন্য। এবং এখনও যে ব্যাপারটার ওপর জোর দেয় সেটা হলো, ন্যায়বিচার। অন্যায় করে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি পেতে হয় এখানে। তা যাঁরা ভারতবর্ষে ঘোড়ার রেস চালু করেছিল তাদের নিজস্ব জায়গায় রেস দেখতে তৈরি হলাম। যে কাগজটা সকালে কিনেছি সেটিতে কোন্ কোন্ ঘোড়া কোন্ বাজিতে দৌড়চ্ছে এবং তাদের আগের বাজির ফলাফল দেওয়া আছে। উল্টেপাল্টে দেখে তত্ত্ব অনুযায়ী যে ঘোড়া দুটি জিতবে বলে মনে হলো তাদের কাগজওয়ালা নির্বাচন করে নি। কিন্তু কথা হলো এপসমে যাবো কি করে। রেস আরম্ভ হবার ঘণ্টা দুয়েক আগে সেজেগুজে রিসেপসনে এলাম। পকেটে পঁচিশ পাউন্ডের বেশি নিইনি। বিদেশে পাউন্ডের দাম অনেক, চাইলেও পাব না। এপসমের নাম শুনে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'ওয়াটালু স্টেশনে চলে যান।' বাঁ দিকে ঘুরে একটু এগোলেই ওয়াটালু ব্রিজ টেমস নদীর ওপরে সেটা গতকাল দেখে এসেছি। স্টেশনটা নিশ্চয়ই সেদিকে হবে। কিন্তু লন্ডনের রেসকোর্সে যেতে গেলে লন্ডন থেকেই ট্রেন ধরতে হবে কেন? নিচে নেমে সেই বৃদ্ধ-ভিখারীকে দেখলাম। একটু স্থানবদল হয়েছে। লোকজন গাড়িঘোড়া অবিরত চলছে কিন্তু সে বসে আছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। কেউ কেউ দু'চার পেনি ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর কম্বলের ওপর। আমাকে দাঁড়াতে দেখে বৃদ্ধ বিরক্ত হলো,এখন গল্প নয়। 'এটা ব্যবসার সময়। যেখানে যাচ্ছ যাও।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্রিজটা পার হয়েই তো ওয়াটালু স্টেশন?'

'কোন্ চুলোয় যাবে?'

'এপসম। রেসকোর্সে।'

'তুমি তো দেখছি চ্যাম্পিয়ন লোক হে। কেটে পড়।'

চ্যাম্পিয়ন শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র জনের কথা আবার মনে পড়ল। সিওর চ্যাম্পিয়ন ঘোড়াটা নাকি আজ জিতবে ডার্বি'তে। বোস্টনে বসে কেউ অনুমান করলে সেটা যে হবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রায় মিনিট কুড়ি হেঁটে নদী পেরিয়ে আমি ওয়াটার্লু স্টেশনে পেঁছে গেলাম। শিয়ালদা স্টেশনের মতই বড়সড় চেহারা তবে অনেক ঝকঝকে। তিন মিনিট অন্তর একটা করে লোকাল ট্রেন আসছে যাচ্ছে। এপসমের ট্রেন কখন কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে তা খুঁজে বের করলাম ইলেকট্রনিক বোর্ড থেকে। প্রায় আট নটা স্টেশন পেরিয়ে ওখানে নামতে হবে। একটা ট্রেন এখনই বেরিয়ে গেল। কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানলাম এক পিঠের ভাড়া তিন পাউন্ড, যাতায়াত পাঁচ। মানে একশ টাকা। মনে হলো খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। রেস দেখতে যাওয়ার জন্যে একশ টাকা গাড়ি ভাড়া দেওয়ার বিলাসিতা পোষায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে জনতা দেখছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো এত লোক স্টেশনে ভিড় করছে কিন্তু তাদের মধ্যে বৃটিশদের সংখ্যা তিরিশ শতাংশের বেশি নয়। সবই কালো অথবা বাদামি চামড়ার মানুষ। এমনকি যারা রেলওয়ের স্টাফ তাদের মধ্যে একজন সর্দারণীকেও দেখলাম। জায়গাটাকে এখন আর বিলেত বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় আছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। এই সময় দুটি মানুষকে প্রায় দৌড়ে কাউন্টারের লাইনে ঢুকতে দেখলাম। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশেক। মহিলা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। মহিলা ফর্সা, লাল স্কার্ট এবং কালো জ্যাকেট পরনে। মাথার চুল ঘাড় অবধি টুপির মতো, সোনালী রঙ করা। ভদ্রলোক রোগাসোগা। পরনে স্যুট। লাইনে দাঁড়িয়েই মহিলা পরিষ্কার বাংলায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার আর চলবে না। ফার্স্ট রেস তো পাবই না যদি সেকেন্ডটাও মিস করি তাহলে আস্ত রাখব না। ভদ্রলোক মিনমিন করে কিছু বললেন। আমি চমকিত।

একজন বঙ্গ তনয়া এই সাজে ওয়াটালু স্টেশনে টিকিটের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবা যায়! ওঁর শরীর এবং রূপের সঙ্গে সাজ-গোজের বেমিল খুব একটা না হলেও বয়সটা যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এটুকু বোঝার সামর্থ্য কি নেই? বাংলা না বললে তিনজন্মেও বুঝতে পারতাম না বাঙালি। এরা যখন রেসের কথা বলছে তখন নিশ্চয়ই এপসমেই যাচ্ছে। অতএব একশ টাকার মায়া ছেড়ে যখন লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমার আগে আরও দু'জন এসে গিয়েছে। শুনতে পেলাম মহিলা বলছেন।

'তুমি নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছিলে তাই আমাকে তুলতে দেরি করেছ।'

'না না। ট্র্যাফিক জ্যাম! আর হবে না রতি।'

'চুপ করো। কতবার বলেছি আমাকে রতি বলে ডাকবে না। আমার নাম আরতি।' এপসমের রিটার্ন টিকিট কাটল দু'জনে। লক্ষ্য করলাম দু'জনে নিজেদের টিকিটের দাম আলাদা দিলো। আমি একজন বঙ্গ সন্তান সামান্য পেছনে দাঁড়িয়ে আছি তা ওঁরা লক্ষ্যই করলেন না। এখানে বাংলায় কথা বললে কেউ বুঝবে না—এমন ভাবনা কাজ করছিল সম্ভবত ভদ্রলোকের মনে। তাই মহিলার কথাতে বিচলিত হচ্ছিলেন না। খানিকটা দূরত্ব রেখে টিকিট পাঞ্চ করিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। ওদের নজরে রাখলেই হবে। আমাকে আর ট্রেন খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। মহিলার মুখ সমানে চলছে। দূরত্বের কারণে বুঝতে পারছি না কথাগুলো। তবে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। তিনটে ট্রেন এল এবং বেরিয়ে গেল। ওরা উঠলেন না। চতুর্থটিতে উঠে বসলেন ওরা স্মোকিং কামরা দেখে। চটপট আমিও উঠলাম এবং জায়গা নিলাম ওদের ঠিক দুটো সিট ছেড়ে। মুখোমুখি সিটটায় একজন মোটাসোটা ব্রিটিশ এসে বসল। মহিলা আয়না বের করে লিপস্টিকটা ঠোঁটে বুলিয়ে নিলেন। তারপর গম্ভীর বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকেন্ড রেসে কে জিতবে?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ধরতে পারছি না। খুব টাফ রেস হবে।'

'ডার্বি'তে ?'

'মনে হচ্ছে দি এম্পায়ার জিতবেই।'

'না যদি জেতে তাহলে তোমার সঙ্গে আজই আমার ছাড়াছাড়ি।'

'তোমাকে তো আমি কত উইনার হর্স দিয়েছি।'

'পাস্ট ইজ পাস্ট। ইদানিং তোমার ব্রেন খুব ডাল হয়ে যাচ্ছে।'

কানখাড়া ছিল ওদিকে। সামনের সিটের ব্রিটিশ হাত বাড়াল, 'লাইটার প্লিজ !' দিলাম। হাউণ্ডের মতো মুখে সিগারেটটাকে খেলনা মনে হলো। তিনবার টান দিতেই দেখলাম সেটা অর্ধেকের নিচে নেমে এল। একটু তৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'গোয়িং ফার ?'

এই ট্রেন কতদূরে যায় জানি না। মাথা নেড়ে বললাম 'এপসম।'

'আঃ। রেসকোর্স ?'

'ইয়েস।'

'এনি গুড হর্স ?'

মাথা নাড়লাম। লোকটা উত্তেজনা নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে এল। খুব আস্তে ওকে আমার পছন্দের ঘোড়ার নাম বললাম। লোকটা খানিকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকাল। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে উল্কি দেখাল। জীবনে অনেক উল্কি দেখেছি কিন্তু এমন উল্কি দেখিনি। একটি মৎসকন্যার পেটে বর্শা বেঁধানো, সে যন্ত্রণায় কাতর। লোকটা উল্কিতে হাত দিয়ে বলল, 'দিস ইজ মাই ড্রিম। আই হ্যাভ টু ক্যাচ হার। আই নিড মানি। লট অফ মানি। ডু ইউ নো দ্য প্রাইজ অফ দ্যাট হর্স ?'

'নো।' মাথা নাড়লাম। লোকটার ভাবভঙ্গি মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন আমি ওকে কোনো ঘোড়ার নাম বলেছি। বোঝামাত্র ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানি শুরু হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারছি। আমি গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রই-

লাম। একটার পর একটা স্টেশন এসেছে। বাইরে আর শহর নেই। মাঠঘাট চাষের জমি, বালি বেলুড় ভদ্রেশ্বর। ভারতবর্ষে যেকোনো রেসকোর্স শহর বা শহরতলিতে। এ তো দেখছি কোলাঘাটে যাওয়ার অবস্থা। স্টেশন আসার আগে ঘোষণা করা হচ্ছে নাম। আমার চিন্তা নেই। নিয়মিত যাত্রীরা আছে সঙ্গে। প্রতিটি স্টেশনের নামের সঙ্গে আমাদের কোথাও না কোথাও একটু পরিচয় আছে। ইংরেজি ভাষা নিয়ে স্কুল কলেজের বিদ্যেতেই এই পরিচিতি গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এপসমের নাম ঘোষিত হলো। ট্রেনটা থামতেই প্রায় অর্ধেক ট্রেন খালি হয়ে গেল। এত ভিড় এড়াতেই আমি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাত্রীরা বেরিয়ে গেলে একটু হাল্কা হলে এগোবো। তাড়াহুড়োয় আর বাঙালি দম্পতির দিকে নজর রাখিনি। মিনিট পাঁচেক বাদে স্টেশন থেকে বের হলাম। একটা মানুষও পড়ে নেই। দূরে ডাবলডেকার বাস দাঁড়িয়ে আছে। কোনো বাড়ি ঘরদোর নেই আশেপাশে। শুধু মাঠ আর জঙ্গল। মনে হচ্ছিল আমি ঠিক স্টেশনে আসিনি। একটু এগোতেই নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা কণ্ডাক্টর ধমকে উঠলেন, 'রেসকোর্স ?' আমি মাথা নাড়তেই একই গলায় বললেন, 'হাঁ করে দেখছ কি ? উঠে পড় যদি সেকেণ্ড রেস ধরতে চাও।' টিকিট কেটে সোজা দোতলার খালি জানলার পাশে বসলাম। মাত্র জনাদশেক মানুষ গাড়িতে। তাহলে শুধু ট্রেনে এসেই হলো না, আবার বাসেও উঠতে হলো রেসকোর্সে পেঁছিতে !

এপসমের যে রাস্তা দিয়ে বাস চলছে তা গুসকরা নলহাটি পাকুড়ের চেহারা। ক্রমশ তাও ছাড়িয়ে গেল। এখন দু'পাশে মাঠ জঙ্গল। এক সময় জঙ্গল গভীর হলো এমন দোতলার জানলায় বসেও আমি আকাশ দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে। সন্দেহ হলো কন্ডাক্টর রসিকতা করেনি তো! আমি কি ঠিক জায়গায় যাচ্ছি ? নিচে নামবো বলে ভাবছি এই-সময় সমুদ্রের গর্জনের মতো শব্দতরঙ্গ ভেসে এল। এই শব্দ ফুটবল

ম্যাচে প্রিয় দল গোল করলে যে আওয়াজ ওঠে তার সঙ্গে মেলে না, বোলার বল করতে শুরু করলে উইকেট নেবার জন্যে দর্শকরা যেভাবে উৎসাহ দেন তাও অনেক দূরের, এই শব্দের সঙ্গে যেহেতু মানুষের আনন্দ এবং কষ্ট ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই কয়েক সেকেণ্ড ধরে একটা অদ্ভুত আকার নেয়। এবং একমাত্র রেসকোর্সে ঘোড়াগুলো যখন বাঁক ঘুরে শেষ দৌড় শুরু করে তখন পৃথিবীর সবদেশের দর্শকরা ওই শব্দ তৈরি করেন নিজেদেরই অজান্তে। অর্থাৎ আমি ঠিক জায়গায় এসেছি।

বাস থেকেই দেখতে পেলাম কয়েক হাজার গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। বাস টার্মিনাসে প্রচুর বাস দাঁড়িয়ে। প্রায় সিকিমাইল পথ গাড়ি আর বাস-এর ফাঁক দিয়ে হেঁটে রেসকোর্সের সদর দরজায় পেঁছিলাম। এর মধ্যে বুঝেছি জায়গাটা রেস ছাড়া নির্জন চুপচাপ থাকে। অর্থাৎ শহর এবং লোকালয় থেকে অনেক দূরে রেসকোর্স করা হয়েছে এবং উৎসাহীদের সংখ্যা তো গাড়ি দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে। টিকিটের দাম শুনে হকচকিয়ে গেলাম। কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না তখন ছ' পাউণ্ডের মায়া ত্যাগ করতেই হলো। দু-একজন যারা তখনও ভেতরে ঢুকছে তাদের পেছন পেছন পা চালালাম।

সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। দু'পাশে গ্যালারি। সামনে এপসমের সবুজ রেসকোর্স দেখে ভালো লাগল। ডিমের সাইজের বিরাট মাঠ। একটা রেস সবে হয়ে গিয়েছে। দর্শকদের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। বুকিদের জন্যে কোনো পাকা বন্দোবস্ত নেই। এরিনাতেই যে যার মতো চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে গেছেন। পরের রেসে দশটা ঘোড়া দৌড়চ্ছে। আমার পছন্দ, যার কথা ট্রেনে বৃটিশ উল্কিপরা লোকটাকে বলেছিলাম, এই বাজিতে দৌড়চ্ছে। বুকে ট্রে নিয়ে বুকিদের এজেন্টরা বেটিং দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওপরে উঠে গেলাম। সুন্দর রেস্টুরেন্ট। কফির

দাম লণ্ডনের মতো। কফি খেতে খেতে রেস দেখব ভাবলাম। ডানদিকে জ্যাকপট উইন প্লেস খেলার কাউণ্টার। লক্ষ্য করলাম বয়স্ক দর্শকদের সংখ্যা বেশি। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস কম, হাঁটা চলায় শিষ্টতাবোধ স্পষ্ট। এবং তখনই সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। উল্কিবাজ আমাকে দেখে হাত নাড়ছে। সটকে পড়ার কোনো উপায় নেই। ও কি আমার পছন্দের ঘোড়া খেলছে? হেসে কাটাতে চাইলাম কিন্তু ও ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠে এল ওপরে। 'হেই মিস্টার। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি যে ঘোড়াটা বলেছিলে তার প্রাইস জানো?' মাথা নাড়লাম। রাগত ভঙ্গিতে লোকটা বলল, 'টোয়েণ্টি টু ওয়ান। প্রমোশন পেয়ে এই ক্লাসে এসেছে। ক্লাস মিট করতে পারবে না। তার ওপর এ্যাপ্রেণ্টিস জকি চালাবে। নো চান্স।'

খুব আরাম লাগল কথাটা শুনে। আমার জন্যে কেউ হেরে যাবে ভাবতেই খারাপ লাগে। লোকটা কিন্তু গোলমেলে। বলল, 'তুমি তো আমাকে ঘোড়াটা খেলতে বললে, নিজে খেলেছ?'

'খেলব। তবে আমি এখানে নতুন, কিভাবে খেলতে হয় জানি না।'

'নতুন? নতুন হয়ে তুমি ঘোড়া বলছ? আর সেই এশিয়ান মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বলে দিলাম তুমি এই ঘোড়াটার নাম বলেছ! হেই মিস্টার। আমি অনেক ভাঁওতাবাজ দেখেছি। যদি তুমি ওই ঘোড়ার ওপর টাকা না লাগাও তাহলে—।'

কফি শেষ করে বললাম, 'চল, আমাকে সাহায্য কর।'

লোকটা আমার সঙ্গে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো এশিয়ান মহিলাকে তুমি বলেছ?'

'ট্রেনে আমাদের কামরায় ছিল। বাসে ওঠার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল।'

মনে মনে বললাম সর্বনাশ হয়ে গেল। দু'পাউণ্ডের টিকিট কাটলাম। লোকটা দেখল। তারপর বলল, 'আমি বাবা কোনো পয়সা লাগাচ্ছি না। ডার্বিতে একটা ঘোড়া মোটা করে খেলব। তোমাকে নামটা বলে

দিচ্ছি, দি এম্পায়ারার।'

জনের মুখ মনে পড়ল। বোল্টনে বসে জন ঠিক করেছে ডার্বিতে জিতবে সিওর চ্যাম্পিয়ন। এখন এই বাজিতে আমার ঘোড়ার দর পনের। জিতলে তিরিশ পাউন্ড পাব। দু'পাউন্ডের বেশি হারতে রাজি নই আমি। গ্যালারির ওপরে উঠে গেলাম হোংকার সঙ্গে। লোকটা আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। ঘোড়াটা হেরে যাবেই ধরে নিয়েছে এবং তখন মারটার লাগাতে পারে যদিও ভরসা আমি দু'পাউন্ড খেলেছি এবং ওর কিছু ব্যয় হয় নি। আমার পছন্দের ঘোড়ার নম্বর আট। বেশ চকচকে টগবগে। চোখের সামনে দিয়ে যখন স্টার্টিং পয়েণ্টের দিকে নিয়ে গেল তখন ওকে আমার ভালো লাগল। নিচের ক্লাসে জিতেছে বলে কেউ ওকে পাত্তা দিচ্ছে না এখন। এই সময় মাঠে একটু সোরগোল উঠল। ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারলাম। সোফিয়া লোরেন্স তার ছেলেকে নিয়ে মাঠে এসেছেন। দর্শকরা তাকে দেখে একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থেমে গেল। সোফিয়ার সঙ্গে রয়েছে তার কিশোর পুত্র। শুনেছি এর মধ্যে দু'দুটো ছবিতে মায়ের সঙ্গে বড় কাজ করে ছেলেটি দর্শকদের নজর কেড়েছে। সোফিয়া লোরেনকে আমি প্রথম দেখি রূপশ্রী সিনেমাহলে 'টু ওমেন' ছবিতে। তখন কিশোর। সুচিত্রা সেনের বাইরে ওই মহিলা আমাকে তখন খুব টেনে-ছিলেন। জলপাইগুড়িতে বসে যা ওঁর সম্পর্কে জানা সম্ভব জেনে-ছিলাম। পরে একটার পরে একটা ছবি দেখেছি আর মুগ্ধতা বেড়েছে। কর্তাব্যক্তিদের একটা দল সোফিয়াকে সযত্নে নিয়ে গেলেন ভি আই পি গ্যালারির দিকে। মেয়েরা মরে যাওয়ার পরেও সুন্দরী থাকেন যদি আমরা সেইভাবে দেখতে চাই। মনে হলো বয়স ওঁকে ভারি করেছে সামান্য কিন্তু আর কিছু নিতে পারে নি কেড়ে। এই সময় সেই শব্দ শুরু হলো। সবাই যে যার নিজের ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। আমার পাশের হোংকা আমাকে আঁকড়ে ধরল, 'হেই ম্যান, ইওর হর্স ইজ

স্টিল লিডিং'। দেখলাম বাঁক ঘুরে আটনম্বর প্রাণপণে ছুটছে আর গোটা আটেক ঘোড়া ঝড় তুলে ধেয়ে আসছে তাকে ধরতে। দূরত্ব কমছে ক্রমশ। আট নম্বরের জকি প্রাণপণে চাবুক চালাচ্ছে। আমাদের সামনে ওরা এল যখন তখন দু'নম্বর প্রায় আট নম্বরের পেটের কাছে এসেছে। কিন্তু, সোফিয়া লোরেন এসেছিলেন বলেই হয়তো ; আট নম্বর উইনিং পোস্টে প্রথম মুখ বাড়িয়ে থাকতে পারল। সমস্ত মাঠে হতাশার শব্দ গড়িয়ে গেল আর আমাকে ছেড়ে দিয়ে হোংকা দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি হতভম্ব। অত বড় চেহারার মানুষ প্রকাশ্যে কাঁদছে কেন ? দু'বার জিজ্ঞাসা করতে কোনোমতে হাত সরাল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করিনি। কি গাধা আমি। উঃ। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে এখন। মাঠে আসার আগে ভেবেছিলাম একটাই ঘোড়া হাজার পাউণ্ড খেলব। বিশের দর দেখে পিছিয়ে গেলাম। ভাবলাম তুমি ভাঁওতা দিয়েছ। তখন খেলে দিলে এখন একশ হাজার পাউণ্ড পকেটে এসে যেত। ওঃ, কি গাধা।'

শোকের প্রকাশ কমে এলে দেখলাম লোকটার চোখে আমি প্রায় ঈশ্বর হয়ে উঠলাম। পেমেণ্ট কাউণ্টারে গিয়ে বত্রিশ পাউণ্ড নিলাম। বুকি-দের কাছে খেললে ট্যাক্স দিতে হতো কিন্তু তাও বেশি পেতাম। বত্রিশ পাউণ্ড মানে সাড়ে ছ'শ টাকা। বাঃ। আর তখনই কাণ্ডটা ঘটল। কোথায় ছিলেন দেখিনি ভিড়ের কারণে, কচি খুকীর মতো ছুটে এলেন মহিলা। হোংকার হাত ধরে গলে পড়তে লাগলেন যেন। হোংকা বোধহয় নিজের ওপর আরও রেগে গেল। বুড়ো আঙুল নেড়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ঘোড়াটা ও বলেছিল।' ভদ্রমহিলা আপ্লুত হয়ে সামনে দাঁড়ালেন, 'আমি ট্রেনেই শুনেছিলান। কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। আপনি তো এশিয়ান ?' খুব কায়দা করা ইংরেজি বলছিলেন মহিলা। মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ। কত খেলেছিলেন ?'

'একশ পাউন্ড। ট্যাক্স কেটে নিতে বলেছিলাম বেটিং-এর সময়। তাই দু'হাজার পেয়েছি।'

'দু'হাজার পাউন্ড' চল্লিশ হাজার টাকার ওপর! সর্বনাশ!'

'আপনি কি সাউথ ইন্ডিয়ান?' প্রশ্ন ইংরেজিতেই।

'না আমি পশ্চিমবাংলার মফস্বলের লোক।' জবাব দিলাম বাংলাতেই।

প্রায় ভগবান দেখলেন মহিলা, 'কি আশ্চর্য! আমি বুঝতেই পারিনি।' আবেগে এবার হাত জড়িয়ে ধরলেন তিনি, 'কি যে ভালো লাগছে বোঝাতে পারব না। ও, হাউ সুইট। আমি মিসেস দত্ত। লন্ডনেই আছি পনের বছর। আপনি।'

নাম বললাম। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। মিসেস দত্ত বললেন, 'কিন্তু আপনি উইনার হর্সের নাম আগেই বললেন কি করে? নিশ্চয়ই সোর্স আছে। অবশ্য আপনাকে কখনও দেখিনি আগে। এই রেস-কোর্সে যারা আসে তাদের মধ্যে বাঙালি থাকলে চিনব না এ হতে পারে না।'

বললাম 'আমি গতকাল প্রথম লন্ডনে এসেছি।'

'আই সি। দেন বিগিনার'স লাক।' ভদ্রমহিলা আমার হাত ছাড়ছিলেন না। দেখলাম দূরে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। মিস্টার দত্তরা চিরকালই স্ত্রীদের এভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন? এরপরেই মিসেস দত্ত প্রশ্নটা করলেন, 'এই রেসে কি খেলব?' ইতিমধ্যে তিনি ফিরে গিয়েছেন ইংরেজিতে ফলে হোঁৎকার বুঝতে অসুবিধে হলো না। আমি মাথা নাড়লাম, 'দুঃখিত। আমি কিছুই জানি না।'

ভদ্রমহিলা তখন রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। হোঁৎকা বলল, 'তুমি কেন ভাবছ জিতলে আমি তোমাকে কমিশন দেবো না।' টোয়েন্টি পার্সেন্ট। ঠিক আছে?' আমি হাত তুললাম, 'সারেন্ডার করছি। সত্যি আমি কিছুই জানি না।' মিসেস দত্ত এবার বাংলায় বললেন, 'ঢঙ করবেন না, বলুন না।'

'এই বাজিতে কিছু নেই।'

'ও, তাই বলুন। তাহলে এই বাজি খেলব না। চলুন রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসি। এই মোটা লোকটা আবার সঙ্গে আসছে কেন? কাটিয়ে দেবো?'

বললাম, 'যা ভালো ইচ্ছে করুন। আপনার সঙ্গে কেউ নেই?'

'ও হ্যাঁ। এ্যাই শোন।' আঙুল তুলে দূরে দাঁড়ানো প্রৌঢ়ের দিকে ইশারা করতেই তিনি এগিয়ে এলেন। মিসেস দত্ত বললেন, 'ইনি বাঙালি। সমরেশ। ওঁর জন্যেই দু'হাজার জিতেছি। তুমি যে কি ছাই টিপ কর। আর এ হচ্ছে চাকলাদার। আমার বয় ফ্রেণ্ড। আগে খুব ভালো ক্যালকুলেট করত এখন গোলমাল হয়ে যায়।'

স্বামী নন অথচ বকুনি খেয়ে যাচ্ছেন স্বামীর মতনই। চাকলাদার বিমর্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি করে ভাবলেন ব্যাচ মিট করবে আট নম্বর। আমার কাছেও ফাস্ট টাইমার ওই হয়েছিল কিন্তু।'

বললাম, 'দেখুন পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছেলেও মেধা আর পয়সার জোরে বিলেতে এসে ডিগ্রি নিয়ে গেছে বৃটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নেয় নি?

প্রৌঢ় খুশি হলেন, 'থ্যাঙ্কস।'

'গল্প করার সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই। তুমি এই মোটা লোকটাকে নিয়ে ওপাশে যাও তো আমি আর সমরেশ একটু কোক খাব।' মিসেস দত্ত হোৎকাব দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এক্সকিউজ মি!' তারপর চাপা গলায় বললেন, 'চলুন।' আবার আমরা রেস্টুরেণ্টে উঠে এলাম। তাকিয়ে বুঝলাম রেস্টুরেণ্ট বটে তবে একই রকম চেহারার আর একটিতে এসেছি। এখানে যা শীত তাতে আমার তৃষ্ণার্ত হবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া একটু আগে খাওয়া কফির স্বাদ জিভ থেকে যায় নি। আমি কোক খাব না জেনে মহিলা যেন রীতিমত শোকগ্রস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে আমার জন্যেই আনুন।'

দাম মিটিয়ে দিয়ে এলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেসকোর্স দেখতে দেখতে মহিলা বললেন, 'আমার অল্পেই গরম লাগে। এই জন্যেই কলকাতায় যেতে পারি না। যখন উপায় থাকে না তখন রিলেটিভসদের বলি তোমরা দার্জিলিঙ-এ এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। আমি এখান থেকে সোজা দার্জিলিঙ-এ চলে যাই। আপনি কি করেন ?'

'লেখালেখি।'

'রেসের ওপর ?'

'না-না। গল্প উপন্যাস।'

'আচ্ছা ! তা মশাই পনের কুড়ি বছর বাংলা গল্প উপন্যাস দেখিনি। পয়সা হয় ?'

'তা হচ্ছে।'

'শুনেছি বাংলা সাহিত্যে এমন লেখা আছে ট্রান্সস্লেট করালে নোবেল পেয়ে যেতে পারে। দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে অফ বিজনেস। কিন্তু সময় সাপেক্ষ। কি খেলব এই রেসে ?'

'বললাম তো, আমি জানি না।'

'আহা ন্যাকা, বলুন না !' সোনালি চুল বাঁহাতে চোখের ওপর থেকে তিনি এমন ভঙ্গিতে সরালেন যে সেগুলো আরও দ্রুত চোখের সামনে ছড়িয়ে গেল। বললাম, 'মিসেস দত্ত, আমার রেস সম্পর্কে পাণ্ডিত্য নেই যেটা চাকলাদার সাহেবের আছে। এখানে এসেছি স্রেফ কৌতূহলে। ডার্বি দেখতে।'

'বেশ, ডার্বিতে কে জিতবে ?'

'অনেকে বলেছে দি এম্পায়ারার।'

'সেটা তো চাকলাদারও বলছে।'

'দেখা যাক।' সঙ্গে সঙ্গে পরের রেসটা শুরু হলো। তীব্র উত্তেজনায় সেটা শেষ হলে মিসেস দত্ত আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'ও সমরেশ, তুমি কি ভালো ! কি ভালো !' বুঝতে না পেরে হাত ছাড়াতে চাইছি

ওর মুঠো আলগা হচ্ছে না, 'চাকলাদার তিন নম্বর খেলতে বলেছিল। তিন নম্বর ফোর্থ হয়েছে। আমার একশ পাউণ্ড চলে যেত! তুমি বললে বলে আমি এক পয়সা খেললাম না। তার মানে তুমি একশ পাউণ্ড পাইয়ে দিলে।'

শেষ পর্যন্ত ডার্বি রেস এল। মাঠ কানায় কানায় ভর্তি। মিসেস দত্ত বোঝাচ্ছেন আজ ইংলণ্ডের আশিভাগ মানুষ এই রেসটা কোনো না কোনোভাবে খেলেছে। রেসকোর্সে না এসেও এদেশে রেস খেলা যায়। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় আইনসঙ্গত বেটিং সেণ্টার আছে। সেখানকার টিভিতে প্রতিটি রেস দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পেমেণ্ট দেওয়া হয়। অনেকক্ষণ থেকেই চেষ্টা করছিলাম এদের সঙ্গ ত্যাগ করার। হোঁৎকা এক পাশে মিসেস দত্ত আর একপাশে এবং চাকলাদার পেছনে। আর আমার মনে হচ্ছিল এই বৃটিশ দর্শকদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারলে আমি বেশি লাভবান হতাম। মিসেস দত্ত এখানে বেশ পরিচিত। কারণ প্রতি দু'মিনিটে অন্তত একবার কাউকে না কাউকে 'হাই' বলছেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'আমি আজ প্রথম এসেছি, একটু ঘুরে দেখতে চাই।'

'ও। তাই নাকি! চলুন আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। মিসেস দত্ত গ্যালারি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হোঁৎকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ডার্বিতে তোমার পছন্দ কি?'

'কিছু নেই। তার পরের রেসে একটা আছে।' যে দুটো ঘোড়া হোটেলে বসে স্থির করেছিলাম তার একটিতে পেমেণ্ট পেয়েছি। দ্বিতীয়টি ডার্বির পরের বাজিতে। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে আমি ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়েছিলাম। ডার্বিতে দি এম্পায়ারার আড়াই-এর দর, কিং অফ দি কিংস নামের ঘোড়া ইভান মানি আর জন সাহেবের পছন্দ সিওর চ্যাম্পিয়ন দশের ছয়। দশ পাউণ্ড খেললাম সিওর চ্যাম্পিয়ন। জনের ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়াক। রেস আরম্ভ হলো।

জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে দেখলাম কিং অফ দি কিংস সিওর চ্যাম্পিয়নসকে হারিয়ে জিতে গেল। দশ পাউণ্ডের জন্যে কষ্ট হলো না, জনের মুখটা মনে পড়তেই খারাপ লাগছিল। অতদিনের হিসেব এক লহমায় ভুল প্রমাণিত হলো। নইলে ডিভোর্সের পরও স্ত্রীকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় বেচারা।

আবার আমি আমার ভাগ্য দেখতে মোটেই রাজি নই। পরের রেস শুরু হওয়ার মুখে হোঁৎকার সঙ্গে দেখা। 'দি এম্পায়ারার' খেলেছে পাঁচশ পাউণ্ড। উন্মাদ হবার দশা। রাগতভঙ্গিতে ঘোড়াটার নাম জানতে চাইল। বললাম, ছুটে গেল কাউণ্টারের দিকে। আর আমিই মিসেস দত্তকে দেখলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এলেন, 'আপনি কি লণ্ডনে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন। আমি আগে চলে যেতে চাই।'

'মিস্টার চাকলাদার?'

'ওকে আমি অ্যাভয়েড করছি। ওর সঙ্গে আমার লাক মিলছে না। এম্পায়ারার খেলিয়ে দুশ পাউণ্ড হারাল। আজকাল ওর সঙ্গে আমার লাক ক্লিক করছে না। চলুন।' আর রেস কোর্সে না থেকে বাস এবং ট্রেন ধরে আমরা লণ্ডনে ফিরে এলাম। ওয়াটালু স্টেশনে পেঁছে মিসেস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরের দিন রেসে আসবেন?' আমি মাথা নাড়লাম, না। চোখে চোখ রাখলেন মহিলা, 'যদি কোনোদিন এপসমে যান দেখা হবে। বাই।' বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন রঙিন মহিলা। খারাপ লাগেনি তা নয়, কিন্তু মনে হলো আর যাই হোক মিসেস দত্ত সম্পর্কের চারপাশে বেড়া তুলতে জানেন।



১৯

লণ্ডন শহরে কি কি দেখার বস্তু রয়েছে তা বাঙালি পাঠক এতদিনে প্রচুর ভ্রমণ কাহিনীতে পেয়ে গিয়েছেন। লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট মাত্র চার পাউণ্ড পঁচিশ পেনিতে শহরের কুড়ি মাইল লাল বাস চালান পিকা-ডেলির দক্ষিণ প্রান্ত থেকে 'রাউণ্ড লণ্ডন সাইটসিয়িং ট্যুর' নামক একটি ব্যবস্থায়। স্যামুয়েল জনসন বলেছিলেন, 'কেউ যখন লণ্ডন সম্পর্কে অনাগ্রহ প্রকাশ করে তখন বুঝতে হবে তার জীবন সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই।' খুব বড় কথা। কিন্তু মিউজিয়াম, বাকিংহাম প্যালেস, ওল্ড বেইলি, স্টক-এক্সচেঞ্জ অথবা ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবে দেখার আগ্রহ আমার কোনোদিনও হলো না। অতদিন নিউইয়র্কে থেকেও আমি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে যাওয়ার কথা ভাবিনি। বরং মনে হয়েছে এই শহরে ডিকেন্সের বাড়ি রয়েছে, শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রীট দেখা যেতে পারে, ওল্ড কিউরিওসিটি শপে যেতে আপত্তি নেই। আর সব চেয়ে ভালো লাগবে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে।

গত রাত্রে হোটেলে ফিরিনি। ফিরেছি আজ ভোরে যখন অন্ধকার

নেই আবার আলোও ফোটেনি। মানসী বড়ুয়া বি বি সি-র ক্লাবে নেমন্তন্ন করেছিলেন ওঁর বাড়িতে রাত্রে খেতে যাওয়ার জন্যে। পঙ্কজ আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে ছুটির পরে এমন কথা ছিল। রাত সাড়ে নটার সময় আমরা বি বি সি থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম পাতলা আলো তখন মরেও মরে নি। কিন্তু শীত তার রেগুলেটার ঘোরাতে আরম্ভ করেছে। আমরা খানিকটা সুখ এবং দুঃখের গল্প করে ট্রেনে উঠলাম। মানসী থাকেন শহরতলিতে। পঙ্কজ জানালে অন্তত মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগবে।

কলকাতা দূরদর্শনে পঙ্কজকে দেখেছি দর্শকের দরবারে চিঠির উত্তর দিতে। যে ভঙ্গিতে তখন কথা বলত এখনও সেই ভঙ্গিটি রয়েছে। ওর জামা কাপড় মুখ চোখ কথাবার্তায় সেই সারল্য মাখানো যা কলকাতায় আসা মফস্বলের ছেলেদের প্রথম বছরে থাকে। বি বি সি-তে চাকরি নিয়ে চলে এসে পঙ্কজ ইতিমধ্যে এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ওর ব্যবহারে। শহরের বাইরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছে সে। বরফ গলার সময় সেই ফ্ল্যাটের জলের পাইপ ফেটে ওর অনেক ক্ষতি হয়েছে। পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতায় এতদিন আড্ডাবাজ জীবন যাপন করে এখানে এসে কেমন লাগছে ?

পঙ্কজ বলল, 'মন খারাপ লাগা, দেশের জন্যে টান বোধ করা—এসব আমি বলব না। আমি তো আর একটু বড় জায়গায় কাজ করব বলে জেনে শুনেই এসেছি। কিন্তু মাঝে মাঝেই খুব একা লাগে। এত বছর কলকাতায় থেকে যে অভ্যেসটা রক্তে ঢুকে গিয়েছিল তার ব্যতিক্রমই একাকীত্ব আনে। আমি তো কখনও চিন্তা করিনি রাত দুপুরে ট্রেন থেকে নেমে একা হাঁটব প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কুঁজো হয়ে। রাস্তাটাকে গোটাতে গোটাতে ঘরের দরজায় নিয়ে গিয়ে চাবি হাতড়ে সেটাকে খুলে আলো জ্বালবো। প্রথম প্রথম খুব রোমাঞ্চ হতো। এখন একা লাগে। লণ্ডনের বাঙালিরা না বাঙালি না ইংরেজ। বউ-এর আসার কথা

আছে। এলে ঘরের বেল বাজালেই চলবে, তালা খুলতে হবে না।'

ট্রেন পাল্টালাম। শুনলাম মানসী মাঝে মাঝে নিজের গাড়িতেও আসেন। সেটাও কম পরিশ্রমের নয়। কারণ এদেশেও ড্রাইভার রাখতে পারেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। প্রায় এগারটা নাগাদ আমরা স্টেশনে নামলাম। টিকিট চেকার গেটে দাঁড়িয়ে। পঙ্কজ তাঁকে ফেরার ট্রেনের সময় জিজ্ঞাসা করল। মাথা তুলে দেওয়াল ঘড়ি দেখে চেকার বললেন, 'এক ঘণ্টা সময় আছে। লণ্ডনে ফিরবেন? উপায় থাকলে রাতটা থেকেই যান। ভোরের ট্রেন চারটে পাঁচ-এ।' বাইরে বেরিয়ে এসে মানসীর বাড়িতে একটা টেলিফোন করে পঙ্কজ ব্যাপারটা বোঝাল। ইদানীং রাত্রের ট্রেনগুলো যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কিছু হামলাবাজ এশিয়ান দেখলেই ঝামেলা করছে। ছিনতাই তো হচ্ছেই, দু তিনটে খুনও হয়ে গিয়েছে। লণ্ডন থেকে আসার সময় মোটামুটি ভালোই যাত্রী থাকে। কিন্তু ফেরার দুটো ট্রেন প্রায় ফাঁকা।

অস্বস্তিতে পড়লাম। মানসী আমাদের খাওয়ার কথা বলেছেন থাকতে নয়। আমার সমস্ত টাকা পয়সা সঙ্গেই আছে। হোটেলে ফেরার চিন্তাটা মাথা দখল করল। পঙ্কজকেও যেতে হবে তিন চারটে স্টেশন। কাল সকালে তার কাজ রয়েছে। পঙ্কজ বলল, 'ভেবে লাভ নেই। চলুন বাইরে যাই।'

স্টেশনের বাইরে এসে মনে হলো সবে সন্ধ্যে হয়েছে। ঘড়ি বলছে এগারটা পনের। যে কোনো মফস্বলী শহরের স্টেশন যদি স্টিল টাউন ঘেঁষা হয় তাহলে এমন চেহারা পাবে। মানসীর স্বামী এলেন গাড়ি নিয়ে। সুন্দর হাসিখুশি একটি বঙ্গ সন্তানকে দেখে চোখের আরাম হলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওঁদের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। ছিমছাম রাস্তার ধারে ছবির মতো বাড়ি। মানসী আপ্যায়ন করলেন, 'আসুন, আসুন, দেরি দেখে ভাবলাম আপনারা আবার সোহোতে ঢুকে গিয়েছেন কিনা।'

'সোহো !'

'ওঃ পঙ্কজদা, আপনি এখনও সমরেশবাবুকে সোহো দেখান নি ?'

'সমরেশদাকে কিছু দেখাতে হবে না। উনি নিজেই পথ চিনে এপসমে গিয়ে রেস খেলে পাউণ্ড জিতে এসেছেন আজ ।' পঙ্কজ জানিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই খুব হৈচৈ করে উঠল । মানসী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রেস নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন, না ? দৌড় ?'

ভেতরের ঘরে জমিয়ে আড্ডা মারছিল শঙ্করলাল, এক দম্পতি এবং মোটাসোটা এক ভদ্রলোক । মহিলা নাচেন । কলকাতা থেকে লণ্ডনে এসেছেন নাচের প্রোগ্রাম করতেই । জানা গেল ইনি সন্তোষকুমার ঘোষকে চিনতেন। শঙ্করলাল তখন কিছুটা পান করেছেন । ঠাট্টা করে বললেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় অথবা নাচে, কলকাতার এমন কেউ যদি বলে সন্তোষদাকে চিনি না তাহলে তাঁর জীবনে কিস্যু হবে না।' ঠাট্টা হলেও কথাটা সত্যি । দু বছর ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে এই ব্যাপারটা দেখেছি । কিছু হয় কি হয় না সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু শিল্পীরা মনে করতেন মানুষটি খুব কাছের । রবীন্দ্রনাথ ওঁর রক্তে । ভালবাসা তৈরি হয়ে যেতে সময় লাগতো না । মাঝ দুপুরে পূরবী মুখার্জীর বাড়িতে হঠাৎ ঢুঁ মেরে তিনটে গান শুনে এসেছি ওঁর সঙ্গে। রবিবারের বিকেলে বাণী ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে তাসের আড্ডায় জমে যেতে দেখেছি যাঁকে তিনিই মুহূর্তে তাস ফেলে দিয়ে ঝগড়া করেছেন গোরা সর্বাধিকারীর সঙ্গে । সকাল নটায় আমার বাড়িতে এসে বাধ্য করেছেন দাবা নিয়ে বসতে । অস্নাত অভুক্ত তিনটে পর্যন্ত খেলে এবং হারিয়ে আমায় নিয়ে গিয়েছেন সুচিত্রা মিত্রের কাছে। এমন মানুষকে বড় অনুভব করি আজ ।

লক্ষ্য করলাম শ্রী ও শ্রীমতী বড়ুয়া পালা করে উঠে যাচ্ছেন আড্ডা ছেড়ে । মানসী কবুল করলেন রান্নাটা কর্তাই ভালো করেন । সেটাকে

উৎসাহ দিতে তিনি প্রায়ই ছুটি নিয়ে নেন। আমাদের সামনে তখন সন্ধ্যা মুখোজীর পুরোন দিনের গান বাজছে। মধ্য রাত্রে লণ্ডনের শহরতলিতে কুয়াশা ভেদ করে চাঁদ ওঠে কিনা জানি না কিন্তু ঘরের মধ্যে ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারার মাধবী রাত ছড়িয়ে পড়েছে।

শেষ ট্রেন চলে যাওয়ার অনেক পরে খাবার পরিবেশিত হলো। এবার মানসীকে সমস্যার কথা বললাম। মানসী বলল, 'কোনো সমস্যাই নেই। যদি যেতে চান টেলিফোনে ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, পঙ্কজকে নামিয়ে হোটেলে চলে যেতে পারেন। পাউণ্ড পনেরর বেশি পড়বে না।'

মধ্যরাত্রে একা অচেনা পথে যেতে আমার সাহস হচ্ছিল না। ট্রেনে ছিনতাই হয় এটা না জানলে হয়তো ঝুঁকি নিতাম। পথে যে ট্যাক্সি-ওয়ালাই গোলমাল করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে। আর পনের পাউণ্ড পঁয়ত্রিশ হতে কতক্ষণ। শঙ্করলাল বললেন, 'তিন ঘণ্টার জন্যে টাকাটা কেন খরচ করছেন মশাই। বেশ তো আড্ডা হচ্ছে। এই করে চারটে পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে ভোরের ট্রেন ধরুন। তখন ট্রেনগুলো খুব সেফ, ছিনতাইবাজরা ঘুমাতে যায়।'

চমৎকার খাওয়া আর সারা দিনের ক্লান্তিতে আমার ঘুম আসছিল। ওঁরা গল্প করে যাচ্ছিলেন। আবছা একটি মুখ আমার সামনে ভেসে উঠছিল বারংবার। পঙ্কজ অথবা মানসী অথবা শঙ্করের গলা দূরে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সেই বাইশ বছরের যুবক যার কোনো আত্মীয় নেই কলকাতা শহরে, যাকে তিরিশ টাকায় মাস চালাতে হয়, রাজা বসন্ত রায় রোডের এক অফিস ঘরের টেবিলে ঘুমিয়ে যার রাত কাটে। মেট্রোর পাশের গলি থেকে তড়কা আর রুটি খেয়ে দৈনিক এক টাকার শেষ দশ পয়সা নিয়ে যে হেঁটে যায় চৌরঙ্গী ধরে গাঁজা পার্ক পর্যন্ত তার চোখের সামনে তখন একটা পাঁচিল ছিল। যা কিছু স্বপ্ন তা সেই পাঁচিলের ওপারেই যা সে দেখতে পেত না। এত বছর ধরে সে প্রাণপণে পাঁচিলটাকে ঠেলে ঠেলে একটু একটু করে সরিয়েছে জায়গা

বড় করতে। কিন্তু সে জানত না কোনো কিছুকে ঠেলে সরাতে গেলে নিজেকেও সেই সঙ্গে সরাতে হয়। ফলে স্বপ্ন থেকে যায় পাঁচিলের ওপারেই। গাঁজা পার্ক থেকে সেকেন্ড ক্লাসে রাতের শেষ ট্রামে ওঠার পর নিয়মিত এক কন্ডাক্টরের সঙ্গে দেখা হতো। খালি ট্রামে যুবকের সঙ্গে সে গল্প করত। সুখ দুঃখের কথা নয়, সায়গলের গান নিয়ে। সেই প্রৌঢ় সায়গলের খুব ভক্ত ছিলেন। যুবক তন্ময় হয়ে শুনত। হয়তো সারাদিনে যে চাপের মধ্যে থাকত রাত দুপুরে সেই মানুষ গুনগুনিয়ে গাইত সায়গলের গলা নকল করে, 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।' লন্ডনের শহরতলিতে মধ্যরাতে হঠাৎ সেই যুবক যেন আমায় প্রশ্ন করল, 'কেমন আছ সমরেশ?'

চারটের সময় পংকজ আর আমি বের হলাম। শংকরলাল মানসীর বাড়িতেই উঠেছে,ও ঘুমাতে গেল। জীবনে অনেক ঠান্ডা সহ্য করেছি, সেই বিবর্ণ হয়ে আসা রাস্তার আলো মাখানো ভোরে বাইরে পা দিয়ে মনে হলো এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। শরীরের সমস্ত হাড় কনকনিয়ে উঠছে, পকেটে হাত ঢুকিয়েও কুঁকড়ে উঠছি। নির্জন রাস্তায় পা ফেলাই ক্রমশ মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। ভোর চারটের সময় মান্দাকফুর পি ডবলু ডি বাংলোর বাইরে সূর্যোদয় দেখতে বেরিয়েছি জিরো ডিগ্রিতে যখন উত্তাপ, তখনও এমনটা হয় নি। কোনোমতে পংকজকে বললাম, 'আমি দৌড়াবো।' এবং বলা মাত্র ছুটতে শুরু করলাম। ডান দিকে শূন্য মাঠ, মাথার ওপরে ঘোলাটে আকাশ, আমার শরীরে উত্তাপ ফিরে আসছিল। অনেক দিন শরীরটাকে এভাবে ছোটাইনি। শীত কমে আসছিল এবং হঠাৎ নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেল। ভোরের ট্রেন কফির গন্ধ জড়ানো। জানলা বন্ধ। আমরা দুজন পাশাপাশি গল্প করতে করতে আসছি। পংকজ নেমে যাওয়ার পর কামরায় আমি আর এক বৃদ্ধা মহিলা। দুজনের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব। এই সময় ছিনতাইকারীরা ঘুমাতে যায়। এটুকুই বাঁচোয়া। ট্রেন পাল্টে

স্ট্র্যান্ড রোডে নেমে যখন হোটেলের দিকে হেঁটে এলাম তখনও আলো ফোটেনি। হোটেলের সদর দরজায় চাবি ঢোকাতে গিয়ে বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। কয়েক পা হেঁটে আবিষ্কার করলাম। আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দিয়ে লোকটি পড়ে আছে। ওই কম্বল কত শীত আটকাতে পারে।

ডাকতে ইচ্ছে হলো। পরিষ্কার বাংলায় ডাকলাম, 'দাদু, ও দাদু!' চতুর্থবারে কম্বল নড়ে চড়ে উঠল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মুখ বের করল। আমাকে চিনতে পেরে ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'মর্নিং ওয়াক?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। কিন্তু তোমার ঠান্ডা লাগছে না।'

'আজ একটু লেগেছিল রাত্রে হোটেলে ছিলে না?'

'না।'

'ঘুমাওনি?'

'না।'

'খুব খারাপ। রাতগুলো ঘুমানোর জন্যে। তুমি বোকামি করলে আমি ফল ভোগ করব না।'

'পঞ্চাশ পেনি দিয়ে যাও। আর একটা সিগারেট।'

বাধ্য ছেলের মতো হুকুম মান্য করে হোটেলে ঢুকে গেলাম। বিছানায় শুয়েও মুশকিল হলো। কিছুতেই ঘুম আসছে না। শুধু এপাশ ওপাশ সার!

স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে যখন পথে নামলাম তখন শরীর ঝরঝরে। সোজা স্ট্র্যান্ড রোড ধরে বেয়ারিং রোড পেরিয়ে চলে এলাম ট্রাফালগার স্কোয়ারে। কয়েক শ পায়রা মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল চাতালে। বিশাল পাথরের সিংহ তাদের দিকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সিগারেট ধরিয়ে একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসেছিলাম। লন্ডনের মানুষেরা এখন ব্যস্ত। তবে আমার মতো অথবা আমার চেয়ে অলস মানুষের সংখ্যা কম নয়। তবে এদের বেশির ভাগই মনে হয়

এশিয়ান। গল্প করছে তো করছেই।

হাঁটতে শুরু করলাম। শ্যাফটসবারি এভিন্যু ধরে খানিকটা গিয়ে ডিন স্ট্রীটে ঢুকতেই সোহো অঞ্চলে পেঁছে গেলাম। সোহোতে বিদেশি রেস্টুরেণ্ট এবং বারের ছড়াছড়ি। লণ্ডনের থিয়েটার পাড়ার উত্তরে, পিকাডেলির খুব কাছেই এই অঞ্চলটা। গোটা পাঁচেক রাস্তা যা অক্সফোর্ড স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে শ্যাফটসবারি স্ট্রীটে শেষ হয়েছে তাই নিয়েই সোহো। খিদে পাচ্ছিল এর মধ্যেই। দেখলাম ফ্রিথ স্ট্রীটে একটি রেস্টুরেণ্টের নাম দি এশিয়া ইণ্ডিয়ান। পাল যেমন বোল্টনে ভারতীয় খাবার বিক্রি করছে এটিও তার সমগোত্রীয় নিশ্চয়ই। খোঁজ নিয়ে জানলাম চিকেনকারি, ভাত আর চাটনির দাম সাড়ে চার পাউণ্ড। অসম্ভব। নব্বই টাকা দিয়ে এই খাবারের জন্যে বসা আমার পোষাবে না। পার্ক স্ট্রীট পাড়ায় পাঁচ রকমের কাবাব, ডিমের পোচ আর মাখন দেওয়া ভাত পাওয়া যায় মাত্র আঠাশ টাকায়। পিটার ক্যাটে। তবে তার নিচে ফ্লুরিতে চা খেতে গিয়ে আবার প্রায়ই মনে হয়েছে বিদেশের যে কোনো মাঝারি দোকানে ওর চেয়ে ঢের সস্তায় চা পাওয়া যায়। ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকলে দু পাউণ্ডে পেট ভরে যাবে।

কয়েক পা হাঁটতেই দু পাশে জুয়োর আড্ডা দেখতে পেলাম। আইন-সম্মত জুয়ো। পয়সা ফেল, হ্যাণ্ডেল ঘোরাও, ভাগ্যে থাকলে কয়েক গুণ বেরিয়ে আসবে জানলা গলে। সময় নষ্ট করার মানে হয় না। জুয়োতে কেউ কখনও দ্বিতীয়বার জেতে না।

এর পরেই শুরু হয়ে গেল লাইভ-শো-এর পাড়া। এর কথাই গত রাত্রে ঠাট্টা করে বলেছিল মানসী। দুপাশের বাড়িগুলোর গায়ে বিজ্ঞাপনে খোলাখুলি বলা হয়েছে যৌন আনন্দ বিতরণ করার কি কি অদ্ভুত ব্যবস্থা তারা করেছে। বেস্ট বেডগেম অফ দি ওয়ার্ল্ড থেকে আরম্ভ করে নানান ক্যাপশন। সেই সঙ্গে নগ্ন মহিলাদের ছবি। নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে মনোজের সঙ্গে এই দৃশ্য দেখেছি। আগ্রহ

দূরের কথা একটা গা ঘিনঘিনে ভাব শরীরে এল। ইতিমধ্যে দালাল জুটে গেছে চারপাশে। তারা নানান প্রলোভন দেখাচ্ছে। সন্ধেবেলায় ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে হেঁটে গেলে যে সব বাক্য এককালে খুব শুনতে হতো তাই এরা আওড়াচ্ছে। তফাৎ এই যে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের দালালরা কালো চামড়ার এরা সাদা। হঠাৎ একজন বলল, 'ইণ্ডিয়ান গার্ল' স্যার, ফ্রেস ফ্রম ইণ্ডিয়া। ওয়ান্স সি। বিউটিফুল উইদ লং হেয়ার।'

অবাক হলাম। সোহোর শরীর প্রদর্শন কেন্দ্রে ভারতীয় মেয়ে? ভারতবর্ষের গ্রাম থেকে যেসব মেয়েকে আরবদেশে পাচার করা হয় তাদের কেউ? হতে পারে। দলটাকে এড়াতে বললাম। আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী নই মোটেই। তোমরা নিজেদের সময় নষ্ট করছ।

মিনিট খানেক একা হেঁটেছি এমন সময় সেই লোকটি দৌড়াতে দৌড়াতে এল 'স্যার লুক, শী ইজ কামিং।' ওর হাত লক্ষ্য করে উল্টো ফুটপাথে তাকালাম। শো হাউসগুলোর সামনে দিয়ে ভিড়কে তোয়াক্কা না করে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী শাড়ি পরা মেয়ে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে ঢুকে গেল। মেয়েটি হাঁটা চলা এবং শাড়ি পরার ধরন বলে দিচ্ছে সে দক্ষিণভারতের নয়। গায়ের রঙ খুব ফর্সা নয়, তবে সে কালোও নয়। বললাম, 'আমি তো আগ্রহী নই।' লোকটা হাসল, ইউ আর ফ্রম ক্যালকাটা?'

মাথা নাড়লাম। সে আরও বিনয়ী ভঙ্গিতে জানাল, 'শী ইজ ফ্রম ক্যালকাটা।' এবার থমকালাম। 'হ্যাঁ, বাঙালি বলে মনে না হবার কোনো কারণ নেই। এবার কৌতূহল হলো। লণ্ডনের সেক্সশপে বাঙালি মহিলা? লোকটাকে বললাম, 'দ্যাখো তোমাদের ব্যবসায় আমি আগ্রহী নই। ওই মেয়েটির সঙ্গে আমি পাঁচ মিনিট কথা বলতে চাই।'

'নো প্রবলেম। টোয়েণ্টি পাউণ্ডস।'

আমি আর বাক্য ব্যয় না করে হাঁটতে শুরু করলাম। লোকটা পেছন ছাড়ল না। কুড়ি থেকে নামতে নামতে পনের, দশ, সাতে এসে

বলল, 'স্যার পে মি টু পাউণ্ডস। বাট শী উইল নট মিট উইদাউট এ বিয়ার।' তার মানে বড় জোর পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ হবে কিন্তু সেটা এমন একটা অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কি খুব বেশি ? রাজি হলাম। যাওয়ার আগে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলাম। সোহোতে এই পাড়ায় লোকে আসে সেক্সশপ দেখতে। ভারতীয়রা অবশ্য দোকানগুলোর সাইনবোর্ড দেখেই চলে যায় বাকিংহাম প্যালেস দেখতে।

যেহেতু আমি দালালটার সঙ্গে হাঁটছি তাই কেউ আমাকে আর বিরক্ত করছে না। একটা দোকানের দরজায় বিশাল চেহারার মহিলা দাঁড়িয়ে কাউকে খুব বকছিলো অসভ্যতা করার জন্যে। মেয়েটার পরনের জিনসের প্যান্টটাকে ড্রামের মতো দেখাচ্ছে। দালালটা তার কাছে আমাকে ছেড়ে দিয়ে সুড়ুৎ করে পাশের গলিতে ঢুকে গেল। মহিলার রাগ তখনও কমেনি। সেই মুখেই আমায় বলল, 'ওয়েলকাম। গো ইন-সাইড।' সামান্য যেটুকু জায়গা মিলল সে সরে যাওয়ায় তার ফাঁক গলে দরজা ঠেললাম। ঢুকতেই ছোট্ট একটা কাউণ্টার। কাউণ্টারের পেছনে টিকটিকির মতো একটা লোক বসে। বলল, 'ফাইভ পাউণ্ডস'। আচ্ছা ফ্যাসাদ। জানালাম আমি শো দেখতে আসিনি। প্রায় মিনিট তিনেক লাগল ওকে বোঝাতে, দালালের সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছে। একটু বিরক্ত হয়েই টিকটিকি ডান দিকের দরজা ঠেলতে ইঙ্গিত করল। ভেতরে ঢুকলাম। রেস্টুরেণ্টের মতো টেবিল চেয়ার সাজানো। ঘর শূন্য। তবে টেবিল চেয়ারগুলো এমনভাবে রাখা আছে যে সবাইকে এক দিকে মুখ করে বসতে হবে। আর সেই দিকটায় বিশাল পর্দা টাঙানো। হঠাৎ কোত্থেকে একটি নিগ্রো মেয়ে এগিয়ে এল যার পরনের পোশাকের জন্য মোটেই বেশি কাপড় খরচ হয় নি। সমস্ত শরীরে মোচড় দিয়ে মেয়েটি বলল, 'শো শুরু হতে সামান্য দেরি আছে। আমরা ততক্ষণ একটু বিয়ার খেতে পারি, কি বল ?' বললাম, 'খুব দুঃখিত। আমি শো'র জন্যে আসিনি। একজনের সঙ্গে কথা বলতে

এসেছি। সেটা শেষ করেই চলে যাব।'

'কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলে ফেললাম।'

'সেটা তোমার সমস্যা।'

মুখ ভেংচে মেয়েটি চলে গেল। পর্দার শেষ প্রান্ত দিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। অর্থাৎ ওদিক দিয়ে যাতায়াতের পথ আছে। একটা চেয়ার টেনে বসলাম। অস্বীকার করব না আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। ঝোঁকের মাথায় এমন কাজ না করলেই হতো। এখন যদি এরা জোর করে আমার পকেটের সব পাউন্ড নিয়ে নেয় তাহলে কোনো ঝামেলাও করতে পারব না। সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলাম উঠে যাওয়া যায় কিনা। এই সময় পর্দার প্রান্ত নড়ল। মিনি স্কার্ট পরা কাঁধ খোলা এক মধ্যবয়সিনী দুলকি চালে এগিয়ে আসতে লাগল। তার কালো চুল থেকে চকচকে জেল্লা ছড়াচ্ছে যা টান টান নিতম্ব পর্যন্ত। এই মেয়েটিকেই যে রাস্তায় শাড়ি পরা অবস্থায় কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম তা বুঝতে সময় লাগল। আমার সামনের টেবিলের এক কোণে নিতম্বের কিছুটা তুলে দিয়ে মেয়েটি কায়দা করে বলল, 'হাই!'

কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছি। স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলে এসেছি। আপত্তি আছে?'

মুখ চোখ শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটা আমাকে বুঝতে চাইছে। বললাম, 'কোনো বদ মতলব নেই। সোহোতে বাঙালি মেয়ে দেখে অবাক হয়েছি তাই।'

'কেন? অবাক হবার কি আছে?' মেয়েটি উঠে হাততালি দিয়ে বলল, 'দুটো বিয়ার', ভাবলাম বলি দুটো নয়, একটার কথা ছিল। কিন্তু মেয়েটি আমায় সময় দিলো না। পাশের চেয়ারে এসে বসল সে, 'দেখুন মশাই, লাইট হাউস, গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতাম সন্ধেবেলা। দুশো টাকাও কোনোদিন হাতে পাইনি। ঘর ভাড়া, পুলিশকে দিতেই চলে যেত অর্ধেক। মাঝে মাঝে লালবাজারেও চলে যেতে

হতো। এখানে রোজ পঞ্চাশ থেকে একশ পাউণ্ড রোজগার করছি নেট। মানে এক থেকে দু'হাজার টাকা। ব্যবসা তো একই।'

'এলেন কি ভাবে ?'

'এক সাহেবকে খদ্দের হিসেবে পেয়েছিলাম। তার আমাকে পছন্দ হয়ে গেল। বলল, 'তোমার এমন চমৎকার শরীর নিয়ে এখানে কেন পচে মরছ ? তার পরামর্শে আমি পাশপোর্ট ভিসা করালাম। করে চলে এলাম।' মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বিয়ার নিল। যে এনেছিল তার পোশাকও তদ্রূপ।

'আপনি কি, মানে এই ব্যবসায় ছোটবেলাতেই এসেছেন ?'

'মোটেই না। যাদবপুরে থাকতাম। সেখান থেকে সিনেমায় নামতে গিয়েছিলাম। হয়ে গেলাম বেশ্যা। রাত্রে বাড়ি ফিরে যেতাম।' মেয়েটা হাসল।

'কলকাতা থেকে লণ্ডনে আসার সময় ভয় লাগেনি ?'

'মিথ্যে বলব না, লেগেছিল। ইংরেজি জানতাম না তো! সেই সাহেব আমাকে রুডির জিম্মায় দিয়ে গেল। রুডি হলো এ পাড়ার একজন শের। আমাকে যাচাই করে রুডি বলল, 'এখন থেকে তোমার জিম্মা আমার। যা পাবে তার পঁচাত্তর তোমার পঁচিশ আমার। কিন্তু কোনো বাস্টার্ড তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। তাই হলো। রুডি আমাকে ইংরেজি শিখিয়েছে। বাঙালি বলে ডিমাণ্ড আছে আমার। এখানকার পেত্নীরা তো হিংসেতে জ্বলে পুড়ে মরে।' খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

'দেশে ফিরে যাবেন না ?'

কোন্ দুঃখে ? ওই কলোনি, ওই রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোতো ক্যাপ্তেনদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা ? উঃ ম্যাগো' মুখ বাঁকালো সে।

'এখানে কোথায় থাকেন ?'

'কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছি। ওই দালালটাকে রেখেছি স্বামী হিসেবে।

নইলে তো এদেশে থাকার অনুমতি পেতাম না। বাড়িতে আমি কিন্তু ভাত খাই। ভাত না খেলে আমি বাঁচবোই না। বিয়ার শেষ। আপনার তো শুনলাম কোনো ধান্দা নেই।'

'না নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এবার আপনার নামটা বলুন।'

তাজ।

তাজ? বাঙালি মেয়ের নাম? অবশ্য মুসলমান হলে আলাদা কথা।

না। এখানে আমার নাম মমতাজ। মানে তাজ। লোকে খুব সহজে ডাকতে পারে।

দেশে কি নাম ছিল?

মমতা। মমতা ভট্টাচার্য। বামুনের মেয়ে। একচোট হেসে নিল সে। তারপর বলল, মমতার সঙ্গে একটা 'জ' দিলেই কিন্তু মমতাজ। আপনি কলকাতায় থাকেন?

হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছি।

হুম। কাটুন এখন। যদি কখনও আসেন রুডির কাছে আমার খোঁজ করবেন। অবশ্য এইডস না হলে। ওই ভয়ে আজকাল সিঁটিয়ে থাকি। জানাশোনা কারো হয়েছে?

দুজন। একটা মরে গেছে। লোকগুলোকে তো বুঝতে পারে না কেউ। তারপর মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'কলকাতায় এইডস পেঁৗছে গেছে?'

হ্যাঁ। যেখানে এই ব্যবসা সেখানে না গিয়ে পারে? উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, 'ছেলেবেলায় উল্টোরথে সিনেমার নায়িকাদের ইন্টারভিউ পড়তাম। আপনি ঠিক সেইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে। আচ্ছা চলি।' সে চলে গেল পর্দার প্রান্ত দিয়ে। আর তার শরীর ঘেঁষে পরিবেশনকারিণী বিল নিয়ে এল। বিল দেখে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। দুটো বিয়ারের দাম দশ পাউন্ড, সার্ভিস চার্জ তিন পাউন্ড। অর্থাৎ তেরটি পাউন্ড আমাকে দিতে

হবে। আক্কেল সেলামি আর কাকে বলে। দেওয়ার পর মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল হাসি মুখে। অর্থাৎ টিপস চাই। তাও দিলাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই দালালটি এগিয়ে এল 'কথা হয়ে গেছে স্যার।'

'বিয়ারের দাম যে এত তা তখন বলনি কেন?'

আপনি তো জিজ্ঞাসা করেন নি।

রাগটাকে গিললাম। কিন্তু শরীর জ্বলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাজের স্বামী?

হ্যাঁ, এটাও আগে জিজ্ঞাসা করেননি।

তোমার বাড়িতে আর কে আছে?

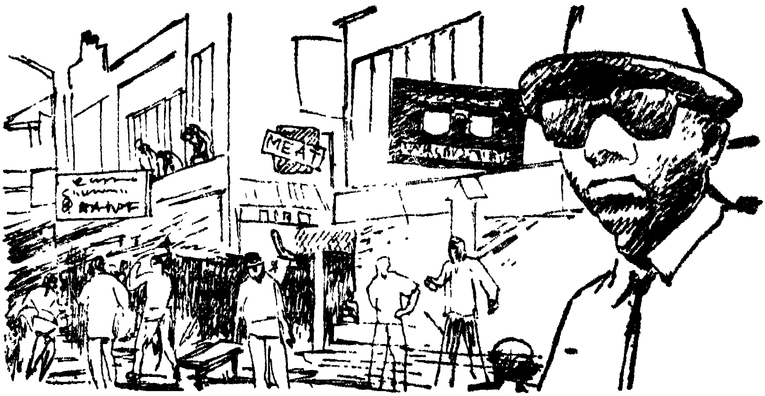
দারা। আমাদের ছেলে।

দারা? তাজের ছেলে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে আসার পর হয়েছে। দেশে নাকি দুটো আছে। বলে নি? ও দেশেই বিয়ে করেছিল?

বাঃ। এসব আপনি জিজ্ঞাসা করেন নি? করেন নি বলেই বলে নি। দিন আমাকে আমার কমিশন। দু পাউণ্ড। খুব গম্ভীর মুখে লোকটা আমাকে কথাগুলো বলল। আর প্রশ্ন করলাম না। যদি এতক্ষণ শোনা সত্যিগুলো মিথ্যে হয়ে যায়।





১২

এ যাত্রায় লণ্ডনে বলার মতো কোনো ঘটনা আমার ঘটেনি। দিন রাত হেঁটেছি যেভাবে ট্যুরিস্টরা হাঁটে। একমাত্র মাদাম তুশোর বাড়ি ছাড়া আর কিছুই তেমনভাবে টানেনি আমায়। বৃটিশদের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। অতএব মিউজিয়াম, স্ট্যাচু, রানীর বাড়ি বা বিভিন্ন গ্যালারি দেখার আগ্রহ হয়নি। মাদাম তুশোর বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম বেকার স্ট্রীট টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে। অতীত ও বর্তমানের খ্যাতনামা মানুষের মূর্তি মোমে ঢালাই করে সেখানে রাখা আছে। এত নিখুঁত সেইসব মূর্তি যে জীবন্ত বলে মনে হয়। মাইকেল জ্যাকসন, জন ম্যাকেনর, এলভিস প্রেসলি, জন এফ কেনেডি থেকে শুরু করে পাবলো পিকাসো অথবা উইনস্টন চার্চিলের সামনে দাঁড়ানো একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। চোখের দিকে তাকাতেই মনে হয়েছিল পিকাসো আমাকে দেখছেন এবং এইমাত্র কথা বলে উঠবেন। চার পাউণ্ড দক্ষিণা, ঢোকার আগে খুব গায়ে লাগছিল

কিন্তু 'দি চেম্বার অফ হররস' দেখে বেরিয়ে আসার পর সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।

লণ্ডনের রাস্তায় সেই বৃদ্ধ ভিখারী ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি। কেউ একজন মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, রাত-বেরাতে রাস্তায় পা দিলে ছিনতাইবাজদের কবলে পড়তেই হবে। তারা নাকি এশিয়ান দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই নিউইয়র্কের মতো লণ্ডনের রাত দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আমি সবত্র দেখেছি। প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখন ভিসা লাগে নি। দ্বিতীয়বারে প্রয়োজন হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। এক মাসের নাম করে ঢুকে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া মানুষের সংখ্যা কম নয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সংখ্যাও কম নয়। এই জনস্রোতকে আটকানোর জন্যেই ভিসার ব্যবস্থা। ইউরোপের দেশগুলোর নাগরিকদের পরস্পরের সামানা পার হতে পাশপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয় না। একজন ফরাসি ইংল্যাণ্ডে বিপদজ্জনক নয় কারণ সে সেখানে জে কে বসবে না। ভারতীয়দের বিশ্বাস করছে না ওরা। এই প্রতিক্রিয়া পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপরে। ঠিক যে-ভাবে এখনও কেউ কেউ কলকাতায় বসে বলে থাকে, 'বিহারীরা এসে দখল করে নিল শহরটা, প্রতিমাসে কতো কোটি টাকার মানিঅর্ডার যায় মুলুকে', ঠিক একই ভাবনা ওদের আমাদের সম্পর্কে। বাঙালি নন এমন ভারতীয় মানেই নানারকম ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। দেশ থেকে আত্মীয়দের এনে সেই ব্যবসায় ঢোকাচ্ছেন। বাঙালি দু-একটা রেস্টুরেণ্ট করেছে নইলে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। অক্সফোর্ড কেম্বিজের দেশে শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা কম নয়। ফলে খুব চটে যাচ্ছে তরুণ বৃটিশরা। শাড়ি পরা মেয়ে দেখলে যেমন তারা আওয়াজ দেয় তেমনি ভারতীয়দের ওপর হামলাও করে। লণ্ডনের প্রতিটি রাস্তা যখন সভ্যভব্য মনে হয়েছিল তখন বি বি সি'র দীপঙ্কর ঘোষের

বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অন্য অভিজ্ঞতা হলো। ওর বাড়ির পেছনে একটা বাজার আছে। সেখানে পেঁছে আমি হতভম্ব। মনে হলো বড়-বাজারে চলে এসেছি। ফুটপাত জুড়ে জিনিসপত্র ডাঁই করে রেখে কেনাবেচা চলছে। পুরো এলাকায় কোনো বৃটিশের দোকান নেই। এমন কি বাজারের ভেতরে যে লোকটা সবজি বিক্রি করছে সে-ও ভারতীয়। আফ্রিকা থেকে আখ এনে ফুটপাতে সাজিয়ে রেখেছে। একেবারে দেশজ অভ্যাস নিয়ে আরাম করে রয়েছে মানুষগুলো। বেশির ভাগই গুজরাটি। ওখানেই জানতে পেরেছিলাম লণ্ডনের টেলিফোন ডাইরেক্টরির অনেকগুলো পাতা প্যাটেলরা দখল করে রেখে-ছিল এতদিন, এবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনেও তারা জিতেছে। একজন আমাকে বলেই ফেললেন, 'সতেরশ সাতান্ন সালে বাঙালিদের বিশ্বাসঘাতকতায় বৃটিশ ভারতবর্ষ দখল করেছিল। দু'শ বছর ওরা রাজত্ব করেছে। ঠিক হ্যায়। কিন্তু দেখবেন বিশশো সাতচল্লিশের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের প্রাইমমিনিস্টারশিপ আমাদের হাতে চলে আসবে।' অন্তত ওই গুজরাটি অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে মনে হলো ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। যে দেশের রেলের কুলি, বিমান-বন্দরের জমাদার, ট্যাক্সিওয়ালা থেকে শুরু করে স্বৈরিণী পর্যন্ত ভারতীয় সেই দেশ-এর চেহারা পঞ্চাশ বছর বাদে কি হবে কে বলতে পারে! আর এই কারণে এত ভারতীয় বিদ্বেষ। এখন পাকাপাকিভাবে থাকার অনুমতি সরকারই দিচ্ছে না। কিছুদিনের মধ্যে যদি 'ভারতীয় হঠাও' আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো শহরে এর মধ্যে হয়েছেও, তাহলে আমরা এদেশে বসে ক্রুদ্ধ হব, দুঃখ পাব, এই পর্যন্ত। আগেই বলেছি, বৃটেনকে নিজের দোষে পস্তাতে হচ্ছে। একটা দেশের কিছু লোক নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে তোদের ডেকে রাজত্বটা দিয়ে দিয়েছিল, দুশ বছর ধরে তাদের শোষণ করে-ছিলি, তারপর ছিবড়ে হয়ে গেলে চলে গেলি, এই ভালো ছিল। তা

না করে সেই দেশের মানুষকে শিক্ষিত করতে গেলি, সেক্সপীয়ার শেলী পড়ালি, খৃস্টান করতে আরম্ভ করলি, ভদ্রতা সভ্যতা শেখালি, এর ওপর মেধাবী ও বড়লোকদের ছেলেদের তোদের দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দিলি। অত বছর ধরে একটা পাশপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করলি না। ফলে কালাপানি পার হবার কড়ি যোগাড় করেই রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা হুড়হুড় করে তোদের দেশে চলে যেতে লাগল সাহেব হবার জন্যে। আর ধর্মভাইরা তো ভেবে নিল তাদের ওটা হকের ব্যাপার। আফ্রিকায় এই ভুলটা খুব বেশি করিসনি। এমন কি বার্মাতেও নয়। ছাগলকে বেড়ার ফাঁক দেখালে কি আর বাগানটাকে বাঁচানো যায়! এখন বেড়া মেরামতের চেষ্টা করলে কি হবে কাজ যা হবার তা হয়েই গেছে। ধর্মের কল বোধহয় এইভাবে বাতাসে নড়ে। আর এইসব অভাজনরা যারা দেশের বাইরে গেলেই হোমসিকনেসে ভোগে তারা লণ্ডনে পা দিয়ে স্বস্তি পায় এই ভেবে যে বাবার দেশে এলাম।

পাহাড়ে যেমন একবার হাঁটলে আর একবার যেতে ইচ্ছে করে বিদেশের বেলাতেও সেটা খুব খাটে। এই আমি, যার অনেক কিছু করার কথা ছিল না, অথচ একটার পর একটা তো হয়েও গেল, দুবার বিদেশ ঘুরে এসেই মনে হয়েছিল, যাক বাবা, এত কপালে লেখা ছিল, সেই আমি জানতাম না পরের বছর আবার যেতে হবে ইতালি আর ফ্রান্সে। সে এক লম্বা সফর। ভারী ভারী ব্যাপারগুলো নিয়ে আর কলম চালাতে চাই না। কয়েকটি মানুষের মুখ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যাদের কথা বলে এবারের মতো লেখা শেষ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এতদিন যার স্যুটকেস নিয়ে বিদেশ ঘুরেছি সেই মুকুন্দ আর আমার অনুজ বন্ধু দেবনাথ ছিল সঙ্গে। ওরা হিসেব করে দেখেছিল চার বছর দেশের ভেতর ঘুরে বেড়িয়ে যা খরচ সেই টাকায় একবার বিদেশ ঘুরে আসতে পারে। প্রথমবার যাওয়ার ব্যাপারে ওরা নির্বাচন করে-

ছিল ইতালি আর ফ্রান্স। উঁচু নজর সন্দেহ নেই।

রোমের এয়ারপোর্টের নাম লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি। একজন শিল্পীর নামে এয়ারপোর্ট এখন পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারিনি। এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে পেঁাছে মন ভরে গেল। একটা ডলার ভাঙিয়ে দু'হাজার লিরা পেয়ে গেলাম। প্রায় এক টাকায় একশ ষাট লিরা বলা চলে। রোম শহরের প্রধান স্টেশনটির নাম টার্মিনি স্টেশন। শব্দের পেছনে ই অথবা আ যোগ করলে অনেক ইতালিয়ান শব্দ তৈরি হয়ে যায়। দেবু এ ব্যাপারে খুব পারদর্শী ছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকে হেঁটে খানিকটা গেলে ভিয়া ক্যাসেলফিডারো। তার একত্রিশ নম্বর বাড়ির বন্ধ দরজার ওপরে লেখা আছে পেন্সন আসমারা। উচ্চারণটি অন্যরকম হবে। দরজার গায়ে বেল। সেটি টিপলাম। বেলের গায়েই স্পিকার। সেখানে গলা বাজল, প্রথমে ইতালিয়ানে 'বুঅন জোরনো?' এক বিন্দু বুঝলাম না। দেবু চাপা গলায় জানাল,'হেলো বলছে'। ইংরেজিতে বললাম, শুনেছি এখানে থাকা যায়। আমরা বিদেশী, থাকতে চাই। এবার সুন্দর ইংরেজি শুনলাম, 'দরজা খুলে গেলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে চেপে বন্ধ করবেন দয়া করে। তারপর কয়েক পা সোজা হেঁটে এলে একটা লিফট দেখতে পাবেন। লিফটের গর্তে পাঁচ লিরা ফেলে তিনতলার বোতাম টিপুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

কলকাতায় আমরা এমন আকাশবাণীতে অভ্যস্ত নই। আলাদীনের স্বপ্নের মতো দরজা খুলে গেল। পয়সা ফেলে লিফটে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তিনতলার বারান্দায় একজন মধ্যবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। সামান্য ঝুঁকে হাসিমুখে বললেন, 'গুড আফটারনুন। আমি সিলভা মন্টোভানি। এই পেন্সন চালাই। কিরকম ঘর আপনাদের চাই?' জানালাম তিনটে বিছানা, পরিষ্কার ঘর আর একটা ঝকঝকে বাথরুম পেলেই চলবে। বাথরুম ঘরে নয়। তিনটি ঘরের বাসিন্দাদের জন্যে

দুটো রয়েছে কমন প্যাসেজের শেষে। ইউরোপে ঘরের ভেতর বাথরুম চাওয়া বিলাসিতা। তিন ডবল দাম হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কেন জানি না। ঘর দেখিয়ে সিলভা জানালেন, আমাদের তিনজনের জন্যে তিনি নেবেন পঁয়তাল্লিশ হাজার লিরা। স্নানের জন্যে পয়সা লাগবে না। অন্য জায়গায় নাকি গরম জলের জন্যে পয়সা দিতে হয়। সকালে এক কাপ চা করে দিতে পারবেন। প্রতি কাপ একশ লিরা পড়বে। খাবার খেতে হবে বাইরে। ঘরের এবং সদরের চাবি দিয়ে দেবেন। আর যদি সম্ভব হয় কাজ চালানোর মতো কিছু ইতালিয়ান শব্দ যেন শিখে নিই। সিলভা চলে গেলে মুকুন্দ কাগজপত্র নিয়ে বসল। এর মধ্যেই বারে বারে বিদেশী মুদ্রাকে ভারতীয় টাকায় পরিণত করে যাচাই করে নিচ্ছে। হিসেব করে সে বলল, 'এই ঘরটায় থাকার জন্যে দৈনিক আমাদের দুশো একাশি টাকা দিতে হবে। দেশে তো আজকাল ভালো জায়গায় দেড়শ টাকার নিচে ঘর পাওয়া যায় না। ঠিকই আছে। কি?' মুকুন্দ এবং দেবু ইতিহাসের ভক্ত। রোম মানেই ঠাসা ইতিহাস। রোম মানেই চার্চ। রোম মানে যেমন নীরো তেমনি মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফেল, ব্রামান্তে, বোর্নিনি। সবার ওপরে আছে সেই প্রাচীনকালের রোমের স্মৃতি বুকে নিয়ে কলোসিয়াম। এসবের বর্ণনায় যাওয়া এই রচনার লক্ষ্য নয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দুই সঙ্গীর তাড়নায় এসব দেখে নিলাম কয়েকদিন ধরে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমার বা দেবুর কোনো বাছবিচার ছিল না। বেচারা মুকুন্দ পড়ত মুশকিলে। কেক বা পাঁউরুটির ওপর থাকতে হতো ওকে। আমরা যে ঘরে থাকতাম তার পাশের দরজাটি সারা দিনরাত আধভেজানো থাকত। একটি লোককে দু-একবার দেখেছি সেখান থেকে বের হতে। মধ্যবয়সী। জামাপ্যান্টে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ নেই। একদিন আলাপ করলাম। হাত নেড়ে বলল, 'ইংলিশ নট মাচ। ইতালিয়ান।' শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার সময় বুকে হাত দিলো। এই কদিনে বুঝে

গিয়েছি ইতালির মানুষও ইংরেজি ব্যবহার করে না। তাদের প্রয়োজন পড়ে না বলেই। কয়েকজন গাইড ভাষাটা শিখে নিয়েছে ব্যবসার সুবিধের জন্যে। ফরাসীদের শুনেছি এ ব্যাপারে স্পষ্ট জেহাদ আছে। ঈর্ষার কারণেই তারা ইংরেজি শেখে না। কিন্তু ইতা-লিয়ানরা প্রয়োজনই মনে করে না। দেবু একটা ফার্স্ট হ্যান্ড ইতালিয়ান গোছের বই কিনে নিয়েছিল। তাই দেখে প্রশ্ন করত সে। বেশির ভাগ সময় উচ্চারণের গোলমালে বিপাকে পড়তে হতো। লোকটিকে পছন্দ হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সমীরদা আমাকে খুব টানত। রোগা গালভাঙা মানুষটি ছবি আঁকতেন হাওড়ার এক গলির ভেতরে চিলেকোঠার ঘরে বসে। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'ইচ্ছে হলে ছবি আঁকি নইলে ঘুমাই।' অনেকটা শিবরামদার কথা। শিবরামদার সঙ্গে গল্প হতো বালক দত্ত লেনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি ঘুমাও তো ? ভালো। ঘুম ভালো জিনিস। ঘুমালে মানুষ বয়ে যায় না। আমি সকালে উঠে দই মিষ্টি নিয়ে গিয়ে পেটে চালান করে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। দুপুরে চারটি মেসের ভাত পেটে পুরে ঘুমিয়ে থাকি। বিকেলে একটু চোখ মিলে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আর এত ঘুমের পরিশ্রম করলে সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকা যায় ?' তাহলে লেখেন কখন ? শিবরামদার সেই উত্তর তো সবাই জানেন। 'কেন ? পরের দিন।'

এই ইতালিয়ান লোকটিকে দেখে মনে হলো ঘুমের সঙ্গে তার মিত্রতা প্রগাঢ়। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় মাঝে মাঝেই চোখ বন্ধ করছিলেন। ঝট করে মাথায় এলো ড্রাগ খায় নাকি ? শিবরামদার সময় ড্রাগ নিয়ে এতো সোরগোল ওঠেনি। নইলে তাঁকেও ওই সন্দেহ করা হতো। ভাঙা ইংরেজিতে লোকটি যা বলল তা সারমর্ম হলো, পেন্সনের এই ঘর তার আস্তানা। সম্পত্তি যা ছিল তা বিক্রি করে ব্যাঙ্কে রেখেছে। খিদের সময় রাস্তায় বের হয় নইলে দিনরাত পড়ে পড়ে

ঘুমায়। অনেক দেখে বুঝেছে যে ঘুমানোর মতো সুখ আর কিছুই নেই। মদ বা ড্রাগ খায় না। ও সবে পয়সা নষ্ট হয়। সপ্তাহে একদিন সন্ধের পর বের হয়। কাছেই একটা থিয়েটারে সুন্দরী মেয়েদের নগ্ন নৃত্য হয়। ঘণ্টা দুয়েক তাই দেখে আসে। কারণ জানতে চাইলে বলল, 'আমার স্বপ্নের সুন্দরীদের এক সপ্তাহের মধ্যে একঘেঁয়ে লাগে। তাই ওটা দেখে নিয়ে পরের সপ্তাহের স্বপ্ন সুন্দরীদের চেহারা পাল্টে দিই।' লোকটা হাসল, 'মন খুলে যদি ঘুমাতে পার তাহলে দেখবে তোমার কোনো কষ্ট নেই। আরে শরীরটা জন্মেছে আরাম পেতে, তাকে আরাম না দেওয়া অপরাধ। খরচের বালাই নেই, নির্দোষ ব্যাপার।' লোকটা ঢুকে যেত নিজের ঘরে। পৃথিবীর কিছু মানুষ দেশ কাল ভেদেও বেশ একই ভাবনা ভাবতে পারে। তার মধ্যে ডুবে যেতে চাইল ওরা দু'জন।

দুপুরবেলায় ভাটিক্যান সিটিতে পোপের বাড়ির সামনের বিশাল চাতালে দাঁড়িয়ে আপেল পাই খাচ্ছিলাম। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এখানে প্রতিনিয়ত আসছেন। শুনেছি এখানে পোপের কথাই শেষ কথা। ইউনিফর্ম পরা প্রহরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাটিক্যানের শিল্পসংগ্রহ দেখে বন্ধুরা অত্যন্ত মুগ্ধ। আমার ঠিক স্বস্তি হচ্ছিল না। রাস্তায় যেটুকু হাঁটছি, নিজেদের মধ্যে কথা বলছি। কোনো ইতালিয়ানের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেলে তিনি ইংরেজি সম্পর্কে অক্ষমতা জানিয়ে চলে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় মানুষ জানা সম্ভব নয়। আপসোস হচ্ছিল, এখানে আসার আগে কেন ইতালিয়ান ভাষাটা শিখে এলাম না।

রোমা টার্মিনি স্টেশন থেকে ভেনিসে যাওয়ার পথে নামলাম ফ্লোরেন্সে। পথে একটা মজার ব্যাপার হলো। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রেনেও ছয়জন করে বসতে পারে এক একটা কুপেতে। সেই আসন হয়তো আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসেই পাওয়া যায়। আমার পাশে একটি মেয়ে খুব টানটান

বসেছিল। ট্রেন চলছে। বন্ধুরা পাশের কুপেতে। হঠাৎ মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায় কিছু বলল। আমি হেসে বললাম, 'সরি, আমি তোমার ভাষা জানি না।' ওপাশের এক ভদ্রলোক কিছু বললেন। মনে হলো ভাষাটা ফরাসি। মাথা নাড়লাম, বুঝতে পারছি না। এবার মেয়েটি ব্যাগ খুলে প্যাড বের করল। ঘসঘস করে কিছু লিখে এগিয়ে দিলো। দেখলাম তাতে লেখা—ইণ্ডিয়ান ? আমি মাথা নাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল। মেয়েটি প্যাডটার ওপর দুটো ছেলে মেয়ের ছবি আঁকল। ছেলেটার তলায় লিখল ইণ্ডিয়া, মেয়েটির তলায় ইতালি। মাঝখানে এক যোগ-চিহ্ন। বুঝলাম এরা রাজীব আর সোনিয়ার কথা বলতে চাইছে। আমি মাথা নাড়লাম। এইভাবে মূকাভিনয় ছবি আর টুকরো ইংরেজি শব্দ নিয়ে প্রায় চার ঘণ্টার পথ কেটে গেলে আমরা ফ্লোরেন্সে নামলাম।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভারী স্যুটকেস টানতে টানতে আমরা নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। ফ্লোরেন্স খুব পুরনো শহর। রাস্তাগুলো ইঁট বাঁধানো। দেবু গাইড বুক দেখে জেনে নিয়েছে কোন্ রাস্তার কোন্ হোটেলে আমরা উঠব। যেন অনেকবার এসেছে এমন ভঙ্গিতে সে রাস্তা চিনিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় প্রায় কাউকে জিজ্ঞাসা না করে ম্যাপ দেখে আমরা পৌঁছেও গেলাম। হাতে একবেলা সময়। রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকাল বেলাতেই ভেনিস রওনা হব। ভেনিস আমাকে টানছে। ইতালির এই পুরনো শহরে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর দারুণ দারুণ কাজ আছে। ইতালিয়ান রেনেসাঁসের দলিল এখানে ছড়ানো। র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা অফ দি চেয়ার' মানেই ফ্লোরেন্স। প্রায় চল্লিশটা মিউজিয়াম আর আর্ট গ্যালারির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো ইউফিজি-গ্যালারি আর পিত্তি প্যানেস। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেনি পিয়াজা স্যান মার্কোর কাছে 'অ্যাকাডেমিয়া' দেখা মানে সমস্ত

ইউরোপ ঘুরে বেড়ানো সার্থক। এখানেই মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মূল ছবিগুলো রয়েছে যার মধ্যে 'ডেভিড' অন্যতম।

অ্যাকাডেমিয়া থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। গ্যালারির সামনের ফুটপাতে দোকান বসে গিয়েছে। ট্যুরিস্টদের কাছে নানারকমের স্যুভেনির বিক্রি করছে এরা। এই ব্যাপারটি একেবারে ভারতীয় মেজাজের। সম্ভবত মুসোলিনি না জন্মালে এদের সঙ্গে বাঙালিদের কোনো পার্থক্য থাকত কিনা বলা মুশকিল।

'হেলো স্যার।' ইংরেজি শব্দ-দুটো কানে আসামাত্র ঘুরে তাকালাম। মধ্যবয়সী একটি স্মার্ট লোক ছোট্ট একটা স্যুভেনিরের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছিল, 'ইউ আর ফ্রম ইণ্ডিয়া, মাইট বি ক্যালকাটা?'

বললাম, ঠিকই বলছ।

'আই ওয়াজ ইন ইণ্ডিয়া। কলকাতাতেও গিয়েছি। এখান থেকে হিচ হাইক করতে করতে পেঁৗছে গিয়েছিলাম। ভারতীয়দের আমি পছন্দ করি।' লোকটা হাসল।

হঠাৎ যেন মনে হলো চেনা মানুষকে দেখছি। লোকটিকে আমরা চা খেতে অনুরোধ করলাম কিন্তু সে রাজি হলো না। বলল, 'এই দোকান আমার বন্ধুর। বেচারার অসুখ তাই আমি এ্যাটেণ্ড করছি। এখন গল্প করতে পারব না। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় কাল সকালে আমার বাড়িতে চলে এসো। ফ্লোরেন্স থেকে বেরিয়েই ডান দিকে একটা মাঝারি পাহাড় দেখতে পাবে। বাস যায়। চলে এসো। সেই পাহাড়েই আমার বাড়ি।'

'জায়গাটার নাম কি?'

'নাম ঠিক কিছু নেই। বাসে উঠে কণ্ডাক্টরকে বলবে সাদা বাড়িতে নামব। জঙ্গল পাথর দেখতে দেখতে, তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে বাড়িটাকে। আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। আজ আমার শাশুড়ি এসেছেন। কাল সকালেই চলে যাবেন।

পাহাড়ে চাষ-টাষ করি। পয়সা ফুরিয়ে গেলে শহরে নেমে কাজ করি। নির্জনতা যদি পছন্দ হয় চলে এস।'

দেবু বলল, 'খুব লোভ হচ্ছে কিন্তু আমরা কাল সকালেই ভেনিস যাচ্ছি। প্রোগ্রাম ঠিক করাই আছে।' ইট বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় লোকটাকে খুব ঈর্ষা হচ্ছিল। এইরকম নির্জনে চুপচাপ থাকার সাধ ছিল আমারও।

দুপুর নাগাদ আমরা ভেনিসে পৌঁছালাম। ট্রেনে আসার সময় অনেক দূর থেকেই জল আর জল দেখতে পাচ্ছিলাম। বন্যার সময় ফরাক্কায় ঢোকার আগে যেমন দু'পাশ জলে ভরা থাকে, ট্রেন চলে ধীর গতিতে অনেকটা সেই অবস্থা। ভেনিসের একমাত্র রেল স্টেশনটির নাম স্ট্যাজোন সেণ্ট্রাল সান্তা লুসিয়া। চার মাইল পাথরের ব্রিজ ভেনিসকে ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। ফ্লোরেন্স থেকে এখানে পৌঁছাতে চার ঘণ্টা লাগল।

ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমেও অনুমান করতে পারি নি শহরের চেহারা। আর পাঁচটা স্টেশন থেকে সান্তা লুসিয়া আলাদা নয়। থাকার জায়গা দরকার। এর মধ্যে দালালের দেখা পেলাম। দেবু দরাদরি করতে লাগল। বইপত্র বলছে ভেনিসের হোটেলগুলো মোটামুটি দুটো জায়গায় ঠাসা। স্টেশনের ধারে আর শহরের প্রাণকেন্দ্র সেণ্ট মার্কস স্কোয়ারের কাছে। জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। লিস্টা ডি স্প্যাগমা নামের রাস্তায় পঞ্চাশ হাজার লিরাতে তিনজনের জন্যে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলল দেবু। যাকে দালাল ভাবছিলাম সে হোটেলের মালিকের ছেলে। একটু আধটু ইংরেজি জানে। বলল, 'এত কমে তোমাদের ঘর দিচ্ছি জানতে পারার পর বাবা যে কি বলবে তাই ভাবছি। এস সঙ্গে।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে মন ভরে গেল। বিশাল চাতালের গায়েই ক্যানেল। গণ্ডোলা, লঞ্চ, বোট চলছে। ওপাশেও রাস্তা। রাস্তার গায়ে সার

দেওয়া বাড়ি। একটা ব্রিজ আছে খালের ওপরে। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম ফুটপাত জুড়ে রকমারি দোকান। ইতালিয়ান সুন্দরীরা দোকান চালাচ্ছে। আমাদের দেখে হাসিমুখে মাথা নাড়ছে কেউ কেউ। চট করে দার্জিলিঙ-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রোম বা ফ্লোরেন্সে এই-রকম দোকান দেখিনি। গায়ে গায়ে রেস্টুরেণ্ট, তার মেনু কার্ড বাইরে টাঙানো। দেবু জানালো ভেনিসের পিজা খেতে হবে। রাস্তা থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে সোজা। খাতাপত্তরে নামধাম পাশপোর্ট নম্বর লিখে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চমৎকার। মুকুন্দ হিসেব করল ভারতীয় টাকায় প্রায় তিনশো পনেরো টাকা পড়ছে প্রতিদিন। দেবু বলল, 'মুকুন্দদা, অত হিসেব করবেন না। ভেনিসে আসব তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

তিনদিন ভেনিসে ছিলাম। একটা ছোট্ট শহর আর তার জল আমাকে বিভোর করেছিল। দিনরাত লঞ্চে চেপে পাড়ি দিয়েছি এদিক ওদিক। ঢেউ-এর ধাক্কা লেগেছে জলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বারান্দায়। এখানে কোনো মিউজিয়াম বা স্ট্যাচু দেখার নেই। প্রকৃতি আর মানুষের আশ্চর্য সহাবস্থান অনুভব করার জন্যেই আসা। এমন কি সেণ্ট মার্কস স্কোয়ারের বিশাল চাতালে অগুনতি পায়রা দেখতে দেখতে উগাণ্ডার যুবকের সঙ্গে গল্প করা, অথবা নীল সমুদ্রের জলরাশি ভেঙে ছোট্ট মোটর বোটে চেপে মুরানো, বুরানো অথবা টরসেল্লো দ্বীপে সারাদিন পাড়ি দিয়ে আসার তুলনা নেই। মুরানোর গ্লাস ফ্যাক্টরির নাম পৃথিবী বিখ্যাত। দেবুর কিছু কাচের জিনিস কেনার বাসনা হয়েছিল। দাম শুনে আঁতকে উঠল। কিন্তু চোখের সামনে যখন কাচ গলিয়ে এক একটা সুদৃশ্য পাত্র তৈরি করছিল ওরা তখন মুকুন্দ বলেছিল, 'কিনেই বা কি হতো দেবু, যেতে যেতেই অত সুন্দর জিনিসটা ভেঙে যেত।'

আমরা চুপচাপ জলের ধারে বসে থাকতাম। প্রেমিক প্রেমিকারা

আমাদের চারপাশে সশব্দে চুম্বন করত কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিতাম না। অন্ধকারে ক্যানেলের নৌকোয় লণ্ঠে আলো জ্বলত। সেই চলন্ত আলো জলের গায়ে দারুণ ছবি আঁকতো। আমরা লঞ্চে ওঠার সময় টিকিট কাটতাম। কিন্তু কোনো বেকারকে কখনও দেখিনি। শুনেছি ভেনিস নাকি একটু একটু করে বসে যাচ্ছে। সমুদ্রের জল এক সময় শহরটা গিলে ফেলবে। নিশ্চয়ই আমি মরে যাওয়ার আগে নয়। প্রতিটি মানুষ হাসিখুশী। এমনকি যে কিশোরী মদ বিক্রি করে সে-ও হাসিমুখে মদের গুণাগুণ বর্ণনা করে। চা খেতে গিয়ে এক অভিজ্ঞতা। দাঁড়িয়ে খেলে যা দাম বসে খেলে তার দেড়া। আবার কেউ এক প্রস্থ লাঞ্চ খেলে এক গ্লাস ওয়াইন বিনি পয়সায় খাওয়ায়। কার্নিভাল শব্দটি সমস্ত শহরের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার মিশে আছে। রাত বারোটায় যখন সন্ধে নামে তখনও ঘরে ফেরার টান আসে না। মোট দুটো রাস্তা। বাকি সব এমনকি গলিগুলোও খাল। গাড়ির বদলে সবাই গণ্ডোলা বা স্টিমবোট রাখেন।

ফেরার টিকিট কাটতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। দেবু কিনে নিয়ে এল টিকিট, 'কি আশ্চর্য, আসার সময় যা পড়েছে এখন তার অর্ধেক পড়ল।' বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অথচ টিকিটে দাম লেখা আছে। অন্তত লিরা পড়তে অসুবিধে হবার কথা নয়। মুকুন্দ খুঁত-খুঁত করল। টিকিটটাকে যাচাই করিয়ে নিতে বলল সে। অপমানিত অপমানিত ভাব নিয়ে দেবু আবার গেল কাউন্টারে। ফিরে এসে বলল, 'ওটা রিজার্ভেশনের চার্জ ছিল। মূল টিকিট কাটতে বলেছিল নিজের ভাষায়, সেটা বুঝব কি করে বলুন।' আমরা হাসলাম। টিকিট ছাড়া ট্রেনে উঠলে কী হতো তা নিয়ে গবেষণা করলাম। এই সময় দুই মহিলাসমেত এক ভারতীয় প্রৌঢ়কে দেখলাম। তিনি জানালেন যে, এই মাত্র এখানে পৌঁছে হোটেলের চার্জ শুনে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁর। আমরা যদি সাহায্য করি তাহলে ভালো হয়। তিনি

মাদ্রাজে থাকেন, ডাক্তার। কনিষ্ঠা মহিলা বললেন, 'যে ঘরে এ্যাটাচড বাথ নেই সেখানে আমি থাকব না। আর তিনটে বিছানা চাই।' ওঁদের নিয়ে এলাম আমাদের হোটেলে। দশ হাজার লিরা বেশি নিলেন বৃদ্ধ মালিক। মহিলাদের ঘরে পেঁছে দিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানাতে এলেন আমাদের ঘরে। খুব মুশকিলে পড়েছেন দুই বউকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে। ছোট কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। আমরা তাজ্জব। উনি চলে গেলে মুকুন্দ বলল, 'লোকটার হিম্মত আছে। একটাতেই সবাই জেরবার দুটোকে সামলাচ্ছে।' দেবু ফোড়ন কাটল, 'বিয়ে না করে এসব বুঝলেন কি করে!'

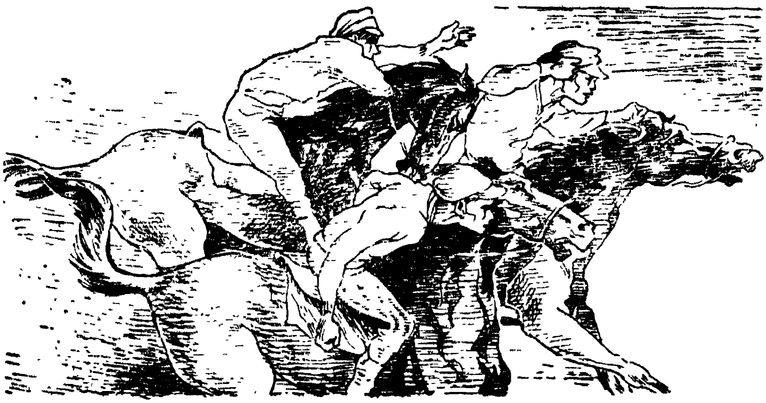
বিকেলে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে খেতে গিয়ে খোল করতালের শব্দ পেলাম। হরেকৃষ্ণ নাম নিতে নিতে সাহেব বৈষ্ণব মেম বৈষ্ণবীরা নাচতে নাচতে যাচ্ছেন। তাদের পরনে গেরুয়া শাড়ি ব্লাউজ। হরেকৃষ্ণ শব্দটা স্পষ্ট। ভিড়ে ভিড়ে একাকার। মুকুন্দ বলল, 'এতদিনে লোক-গুলোকে খুব আপন মনে হচ্ছে সমরেশ। ভাবতে পারেন দেশ থেকে এত দূরে এসে আপনি হরেকৃষ্ণ নাম শুনছেন!'

রাত একটায় ট্রেন। রোমা টার্মিনিতে ফিরব। ট্রেনটায় প্রতিটি কামরা খুঁজে কোনো রিজার্ভেশন চার্ট পেলাম না। যাকেই জিজ্ঞাসা করি সে ভাষা বোঝে না। এদিকে সময় এগিয়ে আসছে। রিজার্ভেশন লেখা কামরাগুলোয় দেখি যাত্রী ঠাসা। অসহায়ের মতো ছুটোছুটি করছি প্ল্যাটফর্মে। এই সময় এক বৃদ্ধ রেলের অফিসারকে দেখতে পেলাম। দেবু তাঁকে টিকিট ধরিয়ে জানতে চাইল কোন্ কামরায় উঠব। তিনি অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখতে লাগলেন। ট্রেন ছাড়ব ছাড়ব ভাব। আমরা অসহিষ্ণু। দেবু হঠাৎ বাংলায় বলল, 'আপনি কি পড়তে পারছেন না দাদু? পকেটে চশমা নেই? বের করে পড়ুন।'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। তারপর পকেট থেকে চশমা বের করে নাকে লাগিয়ে আমাদের হদিস দিলেন। আমরা হতভম্ব। ভেনিসের রেল

স্টেশনে রাত দুপুরে এক ইতালিয়ান ইংরেজি বুঝল না অথচ বাংলা কথার উত্তর এমন সাড়া দিলো কি করে? ট্রেনের কামরায় বসে দেবু বিজ্ঞের মতো বলল, 'আর কোন্ শালা ইংরেজি বলে! এই জন্যেই সরকার স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দিতে চাইছে, বুঝলেন!'





১৩

প্যারিসের দ্যগল এয়ারপোর্টে কাণ্ডটা হলো। আমাদের তিন জনেরই জিনিসপত্র একে একে কনভেয়ার বেল্টে উঠে ঘুরতে লাগলো শুধু দেবুর একটি স্যুটকেসের দেখা নেই। বিদেশে এসে সে যে সমস্ত উপহাররাশি কিনেছিল তা ছিল সেই স্যুটকেসে। একসময় বেল্ট থেকে সবাই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। দেবুর যেন মুখে মাছি পড়বে। ছুটলাম কে. এল. এমের. কাউণ্টারে। সব শুনে ওঁরা একটা ফর্ম এগিয়ে দিলেন। তাতে স্যুটকেসের সাইজ, রঙ, কি কি জিনিস ছিল তার বিশদ বিবরণ লিখে দিতে হলো। তাঁরা ভরসা দিলেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্যুটকেস খুঁজে বের করবেন। স্থানীয় ঠিকানা চাইলেন তাঁরা। তখনও ঠিক নেই কোথায় উঠবো আমরা। টেলিফোন নম্বর নিলাম, পরে জানাবো বলে। দেবুর খুব মন খারাপ। বললো, 'যদি না পাওয়া যায় সমরেশদা খালি হাতে দেশে ফিরতে হবে।' সান্ত্বনা দিলাম, 'পাওয়া যাবেই, আমারটাও পাওয়া গিয়েছিল'।

জীবনের ধন কিছুই যায় না হারিয়ে। সমুদ্রের মতো, ফিরিয়ে দেয়।'
এয়ারপোর্টের লাউঞ্জেই ধাক্কা খেলাম। কেউ কথা বুঝছে না। ইংলণ্ডের এত কাছের দেশের মানুষ ইংরেজি শুনলেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। এক সুন্দরী ফরাসি ললনা দাঁড়িয়েছিলেন। দেবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো হোটেল-টোটেলের খোঁজ কোথায় পাওয়া যায়? তিনি কাঁধ নাচিয়ে চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হদিস মিললো। ইলেকট্রনিক বোর্ডে প্যারিসের প্রায় সব হোটেলের ঘরের দৈনিক ভাড়া আর ফোন নম্বর দেওয়া আছে। বিনি পয়সায় ফোন করে জেনে নেওয়া যায় সেখানে জায়গা খালি আছে কিনা। দেবু তৎপর হলো। মোটামুটি চারশো টাকার মধ্যে একটা ঘর জোগাড় করে ফেললো সে টেলিফোনেই। কথা বলে জেনে নিলো কোথায় তার অবস্থান, কিভাবে পেঁছাতে হবে।
বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ঠাণ্ডা মোটেই হালকা নয়। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড খুঁজতে একটু হন্যে হতে হলো। মুকুন্দ বললো, 'প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালারা খুব অসৎ হয় সমরেশ। পৃথিবীর সব বড়লোকদের পায় তো এখানে। কি করবো বলুন?'
কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু হোটেলে পেঁছাতে নতুন লোকের ট্যাক্সি ছাড়া কোনো উপায় নেই। ট্যাক্সিতে উঠে তিন চার বারের চেষ্টায় হোটেলটার অবস্থান বোঝাল দেবু। লোকটা বেঁড়ে ওস্তাদ। সর্দারজীদের চেয়ে বেশি ইংরেজি বোঝে অথচ উচ্চারণ ধরতে পারে না। ট্যাক্সি চলছে আর দেবু ম্যাপ দেখছে এবং সমানে বাংলায় রিলে করে যাচ্ছে। হোটেলের সামনে পেঁছে বললো, 'একদম ঘোরায়নি। একে বকশিস দেওয়া উচিত।' আমরা শুনেছিলাম প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা নাকি টিপস নেয়। কিন্তু লোকটা কিছুই চাইলো না।
হোটেলের মালিক ইরানী। খোমেইনির বিরোধীদলের মানুষ। পালিয়ে এসে প্যারিসে ব্যবসা করছে। ঘর মিললো দোতলায়। বাথরুম সমেত।

তিনটে খাট। আঃ আরাম। মুকুন্দ বললো, 'করি ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেণ্টে চাকরি, শ্যামবাজার থেকে যাদবপুর যাই রোজ, এখন বসে আছি প্যারিসে। হিসেব মেলে না।'

তাতো হলো। রাত বাড়ছে। খিদেও পাচ্ছে। হোটেলে খাবার দেওয়া হয় না। সেজেগুজে প্যারিসের রাস্তায় বের হলাম। অফিসপাড়ায় রাত নামলে রাস্তায় যে অবস্থা হয় তাই দেখছি। বন্ধুরা আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন আর যেখানেই যাও প্যারিসের রেস্টুরেন্টে খেতে যেও না নিজের পয়সায়। গলাটি নাকি ওরা কুঁচ করে কেটে দেয়। আমরা তাই ফাস্ট ফুডের দোকান খুঁজছিলাম। কোথাও তার চিহ্ন নেই। আসলে ওই পাড়াটাতেই দোকান-পাট কম। হঠাৎ দূরে একটা নিওন সাইন দেখতে পেলাম, ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্ট। ধড়ে প্রাণ এলো। রাস্তা পার হয়ে দেখি এক সর্দারজী মহারাজা সেজে গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। কাচের দেওয়ালের ওপাশে মোমবাতির আলোয় খাচ্ছেন খদ্দেররা। দেবু স্মার্ট গলায় বললো, 'নমস্তে সর্দারজী, হামলোগ ইণ্ডিয়াসে আ রহা হ্যায়।'

সর্দারজী মাথা নাড়লেন তারপর আঙুল তুলে একটা নোটিস দেখিয়ে দিলেন। তাতে ফরাসি এবং ইংরেজিতে লেখা আছে রাত এগারোটার পর বিক্রি বন্ধ। ঘড়িতে এখন এগারোটা বেজে দশ। আমি অনুরোধ করলাম ভেতরে খেতে দেওয়ার জন্যে। বললাম সবাই খুব ক্ষুধার্ত। সর্দারজী ইংরেজিতে অপেক্ষা কর বলে দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেলেন। মুকুন্দ বললো, 'দেখুন পাঞ্জাবিরা কি ভালো ব্যবসা করছে প্যারিসে এসেও।'

খানিক বাদে সর্দারজী বেরিয়ে এসে আমাদের কাউণ্টারে যেতে বললেন ইংরেজিতে। রেস্টুরেণ্টটি বেশ ঝকঝকে। কাউণ্টারে বসে আছেন এক সুন্দরী মহিলা। তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'এখন তো বিক্রি হবে না। আইন মানতে হবে। তবে যেহেতু আপনারা ভারতীয় তাই খাবার

প্যাক করে দিতে পারি।' তাই হোক। মেনু দেখে দেবুর চক্ষু চড়ক-গাছ। মাংসের ঝোল পঁচানব্বুই টাকা, পরোটা একটা চল্লিশ পয়সা। ওরা যখন মেনু দেখছে তখন আমি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোন্ প্রদেশের মেয়ে ? মহিলা বললেন, 'তিনি সাউথ আফ্রিকার মানুষ। এখন প্যারিসের নাগরিক। ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। জানতে চাইলাম এটা কোনো সর্দারজীর হোটেল কিনা! তিনি হাসলেন, 'না না। বাইরে যে ফরাসিটিকে দেখলেন মহারাজা সর্দারজী সেজে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর আমি মিলে এই রেস্টুরেণ্ট করেছি। ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেণ্টের খুব চাহিদা আছে এখানে। তবে আমার যারা কুক তারা ইণ্ডিয়ান। আপনি তো সর্দারজী নন, আপনার কোন্ প্রদেশ ?'

হতভম্ব আমি জবাব দিলাম, 'বাংলা'।

'আই সি। আমার একজন কুক আছে বাংলার।' বলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখন ভাবছি বাইরে যিনি সর্দারজী সেজে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন ফরাসি সাহেব, অথচ আমরা বুঝতেই পারিনি। এবার সাদা এ্যাপ্রোন পরা এক যুবক সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে মহিলা ইংরেজিতে ব্যাপারটা বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাঙালি ?'

যুবক মাথা নাড়লো। 'বাড়ি কোথায় ছিল ?'

সে কিছু একটা জবাব দিলো। শুধু চিটাগাং শব্দটি ছাড়া কিছুই বুঝলাম না। যুবক নমস্কার করে চলে গেল। মহিলা বললেন, 'মনে হলো, তুমি ওর ভাষা বুঝতে পারলে না। কিন্তু আমি জানি ও বাঙালি।'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমরা দুজনেই বাঙালি হলেও আমাদের ভাষা আলাদা।'

মহিলা অবাক, 'আচ্ছা ?'

দেবু বললো, 'সমরেশদা, পরোটা আর মাংসের ঝোল নিলাম। না নিলেই ভালো হতো।'

রাত্রের খাবার হোটেলে ফিরে এসে দেখার পর মুকুন্দ ক্ষেপে গেল। প্রায় একশ টাকায় ঝোল পাওয়া গিয়েছে তাতে দুটো আধ-ইঞ্চি মাপের মাংস ভাসছে।

প্যারিসে কলকাতার বন্ধুদের ঘনিষ্ঠ একটি মানুষ থাকেন। তাঁর নাম অসীম রায়। ওঁর সঙ্গে এর আগে কয়েকবার চিঠিতে আলাপ হয়েছিল। উনি তখন লিখেছিলেন যদি কখনও প্যারিসে আসি তাহলে ওঁর ওখানেই যেন উঠি। কলকাতার অনেক পুরুষ মহিলা নিয়মিত অসীমবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ভোরবেলায় আমি অসীমবাবুকে টেলিফোন করলাম। আমার গলা শুনে উনি বললেন, 'ও আপনি এসে গিয়েছেন। কিন্তু এখন তো ফ্লাইট নেই। ও, হোটেলে উঠেছেন! হোটেলে তো বড্ড বেশি চার্জ। আমার ওখানে আসতে পারেন। তবে আমি আমার মতো থাকি আপনারা আপনাদের মতো থাকবেন। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাই, আমি কিন্তু আপনাদের সময় দিতে পারবো না।' মন খারাপ হয়ে গেল খুব। সত্যি কথা বলতে কি মনে হলো যেচে অপমানিত হলাম। যতদূর জানি ভদ্রলোক অবিবাহিত। একা থাকেন। কিন্তু কথাবার্তায় কোনোরকম আগ্রহ নেই। এ অবস্থায় ওঁর ওখানে ওঠা যায় না। যদিও ভদ্রলোক আমাদের হোটেলের নাম জেনে নিয়েছেন কিন্তু আসবেন বলেন নি।

সকাল থেকেই হোটেলের টেলিফোনে এয়ারপোর্টে ফোন করে স্যুটকেসের হদিস চাইলো দেবু। ভাষায় গোলমাল হচ্ছে। অবশেষে সে বুঝতে পারলো এখনও ওটা পাওয়া যায় নি। আমাদের হোটেলের নাম ধাম জানিয়ে দিলো সে। পেলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

না। সেদিন আমরা যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম তার বিবরণ

এই লেখার বিষয় নয়। আইফেল টাওয়ার, সেইন নদী, নোতরদাম গির্জার বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্যারিসের মাটির তলার রেল লাইন আমাকে আকর্ষণ করলো খুব। পরপর তিনটে স্টেশন নিচে নেমে গেছে। অনেকটাই গোলকধাঁধা। ফরাসিরা বৃটিশ বা আমেরিকানদের ছাড়িয়ে গেছে এই প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারে। ঢোকার আগে টিকিট কাটতে হয়। একই মূল্যের টিকিটে শহরের যে কোনো স্টেশনে নেমে ওপরে উঠে যান। আমাদের প্রাইভেট বাসের টিকিটের মতো বস্তুটি প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সুড়ঙ্গের মুখে মেশিনে পাঞ্চ করাতে হয়। সেটিতে ছাপ পড়ে বেরিয়ে এলেই বন্ধ দরজা খুলে যাবে একজনের জন্যে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অবশ্য কালো ছেলেরা হকারি করছে। কেউ গান গেয়ে পয়সা তুলছে। আর ওইসব গান যন্ত্রপাতি সমেত। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি সর্বত্র। পাশপোর্ট ভিসা না নিয়ে বা সময়সীমা পার হয়ে গেলেও নাকি অনেক মানুষ ফ্রান্সে থেকে যায়। তাদের ধরার জন্যে এরা মাঝে মাঝেই যাত্রীদের কাছে পাশপোর্ট দেখতে চায়। সারাদিন ঘোরার পর বিকেলে আমরা পিগালে পেঁছিলাম। যথারীতি দেবুর ম্যাপ এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছিল। বিশাল চওড়া রাস্তার গায়ে পর পর সাজানো প্যারিসের রাতের আনন্দের আস্তানা। ম্যুলারুজ নামক প্রেক্ষাগৃহটি একটু সম্ভ্রান্ত। তার শো বোর্ডে যেসব ছবি তাতে প্রাচুর্যের চিহ্ন। সবচেয়ে কম দামের টিকিট, একটি শো দেখার জন্যে, ভারতীয় মুদ্রায় পাঁচশো টাকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্যুট নাকি প্যারিস থেকে কাচিয়ে যেত। সত্যি কিনা জানি না তখনকার মূল্যস্তর যা তাতে তাঁর টাকা-পয়সার পরিমাণ কতো ছিল তা আন্দজেও বুঝতে পারবো না। ম্যুলারুজের পাশে অগুনতি সেক্সশপ। প্রকাশ্যে নরনারীর মিলনদৃশ্য অথবা নারীর শরীরের ফটোগ্রাফ সেঁটে টিকিট বিক্রির চেষ্টা সেখানে। এর ওপর দালালরা পথচারী দেখলেই চেঁচিয়ে ডাকছে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগলো, এর মধ্যেই সম্ভ্রান্ত

ফরাসি নারী পুরুষ শিশুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বৃদ্ধারা কেনাকাটা করছেন। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাঁরা এদের উপেক্ষা করছেন। টাইম স্কোয়ার, সোহো অথবা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে এইরকম চোখে পড়ে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই, ফুটপাতে হেঁটে শরীরে একটা গা ঘিনঘিনে ভাব ছড়িয়ে পড়লো যা নিউইয়র্কেও হয় নি। দেবু এবং মুকুন্দ প্রথম দেখছে এসব। তাও উইন্ডোশপিং। কিন্তু ওরাও বললো পছন্দ হচ্ছে না। একটা পত্রিকার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো ইংরেজি কাগজ কিনি। সেটা চাইতেই লোকটা এমন চেঁচিয়ে উঠলো যেন আমি অশ্লীল শব্দ বলেছি। ব্যবসা করতে বসেও এই লোকটা ঘোর ইংরেজ বিরোধী। এলাকাটায় ছিলাম মিনিট পঁয়তাল্লিশ কিন্তু একটি বার-বনিতা আমাদের নজরে আসে নি, যা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

আজও ভুল হয়ে গেল। খাবার কিনে আনা হয় নি রাতের জন্যে। ডিউটি ফ্রিশপ থেকে কেনা স্কচ হুইস্কি খাওয়ার পর মুকুন্দ পাঁউরুটিতে জেলি মাখাতে বসলো। দেবু বললো, 'এরকম ঘটনা আমরাই ঘটালাম মুকুন্দদা। প্যারিসে রাত এগারোটায় হোটেলে বসে স্কচ খাওয়ার পর পাঁউরুটি চিবানো। পাবলিক শুনলে কি ভাববে বলুন তো!' কিন্তু ক্ষুধা তীব্র হলে সর্বগ্রাসী হয়। সত্যটা জানলাম।

ভোরবেলায় টেলিফোন আমাদের ঘুম ভাঙালো। অসীমবাবু। বললেন, 'কি মশাই, হোটেলে খুব আরাম পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। ফালতু পয়সা নষ্ট করছেন। চলে আসুন। আজ দুপুর অবধি বাড়িতে আছি। তিনি পথনির্দেশ দিয়ে লাইন কেটে দিলেন। মনে হলো এবার অনেক আন্তরিক আহ্বান। বোধহয় ফাঁ-এর দিকে তাকিয়ে এইরকম একটা আমন্ত্রণের অপেক্ষায় ছিলাম।

শিয়ালদা থেকে কল্যাণী যতদূর ততদূরই ট্রেনে চেপে এলাম কিন্তু সময় লাগলো প্রায় অর্ধেক। তার আগে একটা গল্প বলে নিই। গত-কাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল ছেড়ে, রাত্রে এসে দেখে-

ছিলাম সব কিছু পরিপাটি করে রাখা হয়েছে। যিনি করেছিলেন আজ তার দর্শন পেলাম। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ফরাসি যুবতী ঘর পরিষ্কার করতে এলো। ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হলো খুব কিন্তু দেখা গেল সে ইংরেজি জানে না। দেবু বাংলায় তাকে বললো, 'আমরা আজই হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি।' মেয়েটি হেসে ফরাসিতে কিছু বললো। বাইরে বেরিয়ে এসে দেবু বলেছিল, 'ফরাসি না শিখে প্যারিসে আসার কোনো মানে হয় না সমরেশদা।

এইরকম একটি বিষয় নিয়ে, সন্তোষকুমার ঘোষের কাছে গল্পটা শুনেছিলাম। সেবার তিনি, দক্ষিণারঞ্জন বসু আর সাগরময় ঘোষ জার্মানিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্তোষদার কথায় বলি, 'তখন আমি দারুণ টগবগে, হ্যান্ডসাম। মেয়েদের সবাইকে সময় দিতে পারছি না এত চাহিদা। দক্ষিণাবাবু বয়স্ক মানুষ, গায়ের রঙ কালো আর একটু শ্লথ। সাগরবাবু তখন যুবকই বলতে পার কিন্তু তিনি তো খাটো চেহারার মানুষ। যেখানে আমরা উঠেছিলাম তার দায়িত্বে ছিল মোটামুটি সুন্দরী এক মহিলা। বুঝলাম আমি যদি একটু আগ্রহ দেখাই তাহলে ওঁর কৃপা পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন আমাকে বিশ্বলোক ডাকছে। বাইরে কতো কাজ, কতো সুন্দরী। ভাবলাম এ তো রইলোই, যাওয়ার আগের দিন দেখা যাবে।

এর মধ্যে একদিন সকালে শুনলাম মেয়েটি চিৎকার করছে ভয়ে। ছুটে গিয়ে দেখলাম দক্ষিণাদা তোয়ালে পরে দাঁড়িয়ে, হাতে আন্ডারওয়ার। সেটার ফিতে ভেতরে ঢুকে গেছে। ভাষা জানা না থাকায় মেয়েটিকে ডেকে ইশারায় সাহায্য করতে বলেছিলেন তাতেই ওই দৃশ্য দেখে সে আতঙ্কিত। পরিস্থিতি সামলালাম। ক'দিন খুব ব্যস্ততায় কাটলো। যাওয়ার দিন এসে গেল। তখন মনে পড়লো মেয়েটির কথা। ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করাও হয় নি। এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় দেখি সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। সি-অফ করতে যাবে। এমন তো সচরাচর

হয় না। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর ভেতর ঢুকে পড়ে খেয়াল হলো সাগরবাবু আসেন নি তখনও। ফিরে দেখি মেয়েটি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছে তো করছেই। ঈর্ষান্বিত হলাম। মেয়েটি আমাদের মধ্যে ওকেই ভালোমানুষ বলে ঠাওরালো? বুঝলে, মেয়েদের বোঝা মুশকিল নয়, অহঙ্কারীদের তারা মোটেই সহ্য করে না। ভাষা না বুঝতে পারলেও না।' গল্পটির মধ্যে কতটা সত্যি আছে জানি না তবে সন্তোষদার বলার গুণে সেই মহিলাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমি। সাগরদাকে যখন ঘটনাটার কথা পরে বলেছি তখন একটা রহস্যময় হাসি হেসেছেন তিনি। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে সন্তোষদার গল্প মনে পড়লো।

স্টেশনটা নির্জন। ট্রেন চলে গেলেই ঘুঘু ডাকে। ট্রেনে আসার সময় দেখেছি দু'পাশে বাড়িঘরও কম। স্টেশন চত্বরে একটা দোকানও নেই। রেলের এক কর্মচারির কাছ থেকে রাস্তার হদিস জেনে নিয়ে ভারি স্যুটকেস টেনে হাঁটছিলাম আমরা। দেবুর একটা স্যুটকেস কম। সেটা থাকলে কি হতো জানতে চাইতেই সে জানালো, 'বইতাম, কষ্ট হলেও বইতাম।'

শেষ পর্যন্ত আমরা অসীমবাবুর বাড়ির নম্বরটা পেলাম। জায়গাটার নাম এ্যাস্টনি। বারো নম্বর রু দ্য গেইমেস-এ একটি গেট রয়েছে। ভেতরে অনেক গাছপালা। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই অসীমবাবুকে দেখতে পেলাম। একটি দীর্ঘদেহী ছিপছিপে শরীরের প্রৌঢ় বাগান করছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, 'এসে গেছেন। ভালো। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ির চারপাশে বাগান। পেছনের গেট খুলে বললেন, 'আসুন।' কাঠের পালিশ করা সিঁড়িতে পা রাখতেই শব্দ হতে লাগলো। দোতলায় একটা হল-ঘর, কিচেন, টয়লেট। তিনতলায় তিনখানি ঘরের দুটো আমাদের জন্যে বরাদ্দ হলো। জিনিসপত্র রাখার পর আমার দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সমরেশ ?'

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ভুল ভেঙেছিল। মানুষটির কথাবার্তার ধরনই ওইরকম। একা প্যারিসের উপকণ্ঠে ছিমছাম বাড়িতে ভালোবেসে থেকে এক ধরনের কাঠ কাঠ ভাব ওপরে ওপরে এসে গিয়েছে। অনেকেই সেখানে ধাক্কা খেতে পারে।

অসীমবাবু একটা রেস্টুরেণ্ট চালু করেছেন। সে বিষয়ে খুব ব্যস্ত। আমাদের কফি করে খাওয়ালেন। মুকুন্দর অভ্যেস ছিল। কলকাতার ওর বিশাল ফ্ল্যাটে একা থাকতে হয় বলে অনেক কাজ নিজেই করে। কাপ ডিস ধুতে ধুতে দেবু বললো, 'এই দৃশ্য যদি একবার শ্যামনগরের বাড়ির লোকজন দেখতো তাহলে আঁতকে উঠতো। কিন্তু ভালো লাগছে, জানেন!'

অসীমবাবু বললেন, 'শুনুন। সব কিছু দেখে নিন। চাবি দিয়ে যাচ্ছি। যখন বের হবেন তখন সব বন্ধ করে যাবেন ভালো করে। আর হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে কার রান্নাঘরে যাওয়ার অভ্যেস আছে?'

মুকুন্দ বললো, 'আমি একটু আধটু নিজের জন্যে করি।'

'তাহলে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। একবার কলকাতা থেকে কয়েকজন এসেছিল। তার মধ্যে একজন নামকরা লেখিকা ছিলেন। তিনি খুব স্মার্টনেস দেখিয়ে গ্যাসে রান্না করতে গিয়ে এমন কাণ্ড করেছিলেন যে বিরাট দুর্ঘটনা থেকে রক্ষে পেয়েছি।' অসীমবাবু রান্নাঘর বুঝিয়ে দিলেন। আমরা জানলাম হাতের নাগালে সব কিছু রাখার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন। এমনকি কাঠের মিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত। বললেন, 'এ বাড়ির অনেক কিছু আমার করা, হাতে সময় পেলেই করে ফেলি। ও হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস কারো আছে? থাকলে দয়া করে খাবেন না। সুনীল, আমার বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ওই করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে একটা কাণ্ড করে রেখেছে।'

নিষেধগুলো পর পর শুনলে আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক। পরে মনে

হলো ভদ্রলোক খুব খারাপ কিছু বলছেন না। ওঁকে দেবু স্যুটকেস হারানোর গল্প বললো। এয়ারপোর্ট থেকে যে রসিদ পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন। ওপাশে সাড়া দেওয়ামাত্র ফরাসিতে বেশ ঝাঁঝিয়ে কথা বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আপনাদের চিন্তা নেই। স্যুটকেস আসছে। আমি একটু বেরোচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো। আপনারা ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করতে পারেন।'

স্যুটকেস প্রাপ্তির খবরে দেবু উল্লসিত। অসীমবাবু বেরিয়ে গেলে আমরা বাগানে নেমে এলাম। বালীগঞ্জের এক বঙ্গসন্তান প্যারিসের উপকণ্ঠে বাড়ি কিনে নানা রকমের গাছগাছালি লাগিয়ে দাপটে আছেন নিঃসঙ্গ হয়ে, ভাবা যায়? আমরা এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম। অনেক বছর আছেন যখন তখন অসীমবাবুর জীবনে কি কোনো ফরাসি ললনা আসে নি? আর এলেও এখন তো দেখছি না। একা একা এইভাবে জীবন কাটানো কি সম্ভব? মুকুন্দ জানালো সে পারবে কিন্তু দেবু বা আমি একমত হলাম না।

এইসময় একটা ভ্যান এসে দাঁড়ালো বাড়ির গেটে। আমি এগিয়ে গেলাম। ড্রাইভার পেছন থেকে একটা সুদৃশ্য ভারি স্যুটকেস বের করে নিয়ে এগিয়ে এলো। দেখেই মনে হলো খুব দামি স্যুটকেস এবং দেবুর সঙ্গে ছিল না এটা কারণ কলকাতায় সম্ভবত পাওয়া যায় না। লোকটা স্যুটকেস নামিয়ে রেখে ফরাসিতে কিছু বলে কাগজ বের করলো। বুঝলাম সই করে মাল বুঝে নিতে বলছে। দেবুকে ডাকতেই সে ছুটে এলো, 'কি আশ্চর্য! এটা আমার স্যুটকেস নয়। কার জিনিস কোথায় এসেছে?'

লোকটি মাথা নাড়লো। তার মুখ থেকে অনর্গল ফরাসি বের হচ্ছিল। দেবু ইংরেজি চালালো কিছুক্ষণ, শেষ পর্যন্ত বাংলা বলা শুরু করলো। ফরাসি আর বাংলার চাপান উতোর চলার পর লোকটি রুমাল

বের করে মুখের ঘাম মুছলো যদিও বাইরে বেশ ঠান্ডা। আমি শেষ পর্যন্ত দেবুকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ফেলে দিও না। রেখে দাও, তোমারটা পেলে ফেরত দেবে। কুপরামর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা বলতে লোকটিও সাহায্য করেছিল। সে যেন স্যুটকেস নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারলেই বেঁচে যায়। এইসময় অসীমবাবু এলেন। ফরাসিতে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানালেন, 'এ এরোপ্লেন কোম্পানির লোকই না। চুক্তিতে মালপত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। সই না করে দিলে ভাড়ার পয়সা পাবে না। আমি লিখে দিচ্ছি এই স্যুটকেস আমাদের নয়।' মাল ফেরত নিয়ে লোকটি চলে গেল। আমরা অনুমান করলাম ওই স্যুটকেসের ভেতর হয়তো কয়েক হাজার ডলার ছিল। কল্পনা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু হাজারের বেশি উঠতে পারলাম না।

অসীমবাবুর বাড়িতে আমরা সম্রাটের মতো ছিলাম। পাশের ডিপার্টমেণ্টাল শপ থেকে বাজার করে আনতাম। মুকুন্দ রান্না করতো। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাসন ধুয়ে দরজায় তালা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে স্টেশন যেতাম। ট্রেন ধরে প্যারিসে। মুকুন্দ ল্যুভ দেখলো প্রাণভরে। প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে। সেখানে গিয়ে মোনালিসার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্নভঙ্গ হলো আমার। আকৈশোর জানা রহস্যময়ীর হাসিটি আমাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করলো না। অন্য কোনো ছবির সামনে ভিড় না থাকলেও মোনালিসার সামনে মানুষ জমছেই। খুব খারাপ লাগলো। এইজন্যেই পণ্ডিতরা বলেছেন স্বপ্নের সুন্দরীদের সামনে কখনও যেতে নেই। অথচ ভেনাসের মূর্তির সামনে পৌঁছে শিহরিত হলাম। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শ'খানেক মানুষের মাথা ডিঙিয়ে সেই হস্তবিহীন অহঙ্কারিণী আমাকে চুম্বকের মতো টানলো। ঘুরে ঘুরে যেদিক দিয়েই তাকে দেখতে চাইলাম মনে হলো অদূরে অহঙ্কার

জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে পড়ছে চিবুক, গাল, চোখ, কপাল থেকে। শুধু এই ভেনাসকে দেখতে আমি আর একবার প্যারিসে যেতে রাজি। প্যারিসের আড্ডাখানাগুলো, বর্ণাঢ্য রাস্তা, ফলি বাজারে গিয়ে নগ্ন অপেরা দেখে মোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনগুলো যখন ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন মুকুন্দ আফসোস করছিল যে অনেক দেখা বাকি থেকে যাচ্ছে যার অন্যতম হলো ভার্সাই-এর প্রাসাদ। এইসময় প্রীতি সান্যাল টেলিফোন করলেন। দেশ পত্রিকায় প্যারিসের চিঠি লেখেন মহিলা, এটুকুই জানতাম। অসীমবাবুর কাছে শুনেছেন আমাদের কথা; যাবো কি যাবো না ভাবছি তখনই জানলাম ওঁর বাড়ি থেকে ভার্সাই-এর প্রাসাদ খুব কাছেই। অতএব আর না বলা নেই।

দেবু প্যারিসের পাতালরেল সম্পর্কে প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছে। ওই পথ চিনিয়ে যে স্টেশনে নিয়ে এলো তার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দেখলাম নিরিবিলি দুটো চওড়া রাস্তা সামনে। আর খানিকটা দূরে পার্কিং লটে এক বঙ্গললনা বসে আছেন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে। আমরা এগিয়ে যেতে শাড়ি পরা মিসেস সান্যাল হাসিমুখে নেমে এসে বললেন, 'স্বাগতম। ঠিক সময়ে এসে গেছেন আপনারা। চলুন আপনাদের আগে রাজপ্রাসাদ দেখিয়ে তারপর গরিবের বাড়িতে নিয়ে যাবো।'

আমরা খুব ছিমছাম এবং নির্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেশ পত্রিকার সুবাদেই মিসেস সান্যাল আমাদের সাহিত্যের হালফিল খবর রাখেন। বললেন, 'দশ বছর উপন্যাস না লিখেই আপনি আকাদেমি এ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেলেন, এটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার।' নিজের কথা আলোচনা হোক চাইছিলাম না। জানলাম, জাতিপুঞ্জের বড় একজন অফিসার ওঁর স্বামী। ভদ্রলোককে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। ছেলেমেয়েরা প্যারিসেই পড়াশোনা করে।

আধ ঘণ্টাটাক যাওয়ার পর আমরা সবুজ ঘাসের বনে ঢুকলাম।

ইংরেজি কাকে উড বলে তার ব্যাখ্যা অভিধানে আছে কিন্তু শব্দটি শুনলেই আমার মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তাই এখন চারপাশে। ফাঁকা ফাঁকা গাছেরা আকাশ ছুঁয়েছে, তলায় যতদূর তাকানো যায় সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। গাড়ি পার্ক করে আমরা হাঁটতে লাগলাম। ফরাসী রাজারানীরা যেখানে প্রমোদবিহার করতেন সেই বিশাল জলাশয়টির পাশ দিয়ে আমরা রাজপ্রাসাদের ওপরে উঠে এলাম। এই সেই প্রাসাদ যেখানে বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। রাজকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে পেরেছিল। এখানেই থাকতেন সেই মহিলা যিনি রুটি খেতে পায় না বলে কেক খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাজার বাড়ি, রানীর বাড়ি, ঘোড়াশালা এবং সেই গেট যেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা করেছিল। দেখতেই দেখতেই আলো নিভলো।

সন্ধেবেলায় আমরা খুব আন্তরিক আড্ডা মারলাম মিসেস সান্যালের বাড়িতে। অসীমবাবু চলে এসেছেন এখানে। মিসেস স্যান্যালের মেয়ে ভালো ছাত্রী, নাচে। ওর বন্ধু একটি যুগোশ্লাভীয় ছেলে এসেছিল বাড়িতে। লণ্ডনে উচ্চশিক্ষার্থে যাবে মেয়েটি। সেই বিষয়ে আলোচনা। বাঙালি মেয়ের সমস্যা। অনেক খাতে কথা বয়ে গেল। জানা গেল প্যারিসেও ভারতীয় বারবনিতা আছে। মধ্যরাত্রে আমরা যখন বিদায় নিলাম দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস সান্যাল বললেন, 'আবার আসবেন।' কে বলে আমরা কলকাতায় নেই।

আসলে ওই কথাটাই ঠিক। একজন বাঙালি বিদেশে গেলে বিদেশটা বিদেশই থাকে। তাকে সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় আর তা থেকেই এক ধরনের একাকীত্ব বোধ জন্মায়। কিন্তু দুজন বাঙালি একত্রিত হলেই বিদেশের পরিবেশকে টপকে নিজেদের আবহাওয়া টেনে আনতে বাঙালির জুড়ি নেই। মুকুন্দ বলেছিল, 'রাজস্থানে

বেড়াতে গিয়েছিলাম। একজন বিদেশিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দেখেছিলাম ওরা কিভাবে নিজেদের চটপটে রাখে। এবার বিদেশে এসে বুঝলাম আমাদের মাঝে মাঝে বেরুনো উচিত। শুধু একবার বিদেশে এলেই তিনচার বছর তার আর্থিক ঝামেলা সামলাতে হিমসিম খেতে হবে। এই যা।' দেবু বলেছিল, 'এইজন্যেই সরকার তিন বছরের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ইস্যু করছে না। সামলে ওঠার সময় দিতেই।'

হয়তো। কিন্তু আমরা যা করি তার উল্টোটাই করা উচিত। বিদেশে গেলে ফিরে আসার দিন ছাড়া কোনো বাঙালির সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়। প্রতিকূল পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কারের আনন্দ যাঁরা পেতে চান তাঁদের জন্যে এই একটি সৎ উপদেশ।